তরুণের স্বপ্ন

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

পত্রাবলী

নিবেদন

গত ১৩৩০ সাল হইতে এখন পর্য্যন্ত আমার যে সকল পত্র ও প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আজ তাহারই কয়েকটী সংগ্রহ করিয়া 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকাশিত হইল। সময়ের অল্পতা হেতু সকল পত্র ও প্রবন্ধ এখন প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। এই গ্রন্থখানি জনপ্রিয় হইলে ভবিষ্যতে অন্যান্য বিচ্ছিন্ন পত্র, রচনা ও বক্তৃতা একত্রে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। ইতি—১০ই পৌষ, ১৩৩৫।

বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

১নং উডবার্ণ পার্ক,

কলিকাতা।

প্রকাশকের নিবেদন

'তরুণের স্বপ্ন' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দেড় বৎসরের মধ্যে দুই সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে এত বিলম্ব কেন হইল এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে হয়। কিন্তু গত আট বৎসরের রাজনৈতিক অবস্থা যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা এ প্রশ্ন করিবেন না। বস্তুতঃ ভবিষ্যতে যে তরুণের স্বপ্ন পুনরায় প্রকাশিত করিতে পারিব—এ ভরসাই একসময় প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। গত দশবৎসরের মধ্যে দেশের আবহাওয়া এবং দেশবাসীর চিন্তাধারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু 'তরুণের স্বপ্ন'-র যে "গোড়ার কথা" তাহা দশবৎসর পূর্ব্বেও যেরূপ সত্য ছিল—বর্ত্তমানে তদপেক্ষা আরও যেন অধিক তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে যে ঐকান্তিকতা,

আগ্রহ ও সাধনার প্রয়োজন তাহা আমরা আজও লাভ করিতে পারি নাই। তা না হইলে আজও দেশে নূতন জীবন ও নূতন কর্ম্মস্রোতের প্রেরণা দেখিতে পাইতেছি না কেন? অবশ্য কাগজে-কলমে হিসাব দিতে গেলে হয়ত আমরা বলিতে পারি—দেশে গণ-আন্দোলন এতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, শিক্ষিতের সংখ্যা এতবৃদ্ধি পাইয়াছে, ব্যবসায়-সংখ্যা এতগুলি বৃদ্ধি পাইয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু এই সংখ্যা নির্ণয়ের উপরই কি আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রোৎকর্ষ প্রমাণিত হয়? বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে—নানারূপ বিরোধী সংঘ ও সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া তাহাও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সকল চিন্তা ও কর্ম্মধারা সাফল্য-মণ্ডিত করিবার যাহা প্রয়োজনীয় ও একমাত্র ভিত্তি—ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন—তাহা আমরা কতদূর সাধন করিতে পারিয়াছি তাহাই হইল 'তরুণের স্বপ্ন'র প্রথম ও শেষ প্রশ্ন। সকল সাধনা ও সাফল্যের গোড়ার কথা ব্যক্তিগত আত্মবিকাশ। এই আত্মবিকাশ করিতে না পারিলে শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও প্রকৃষ্ট পন্থাও ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া পড়ে! আজ তাই বাঙ্গলা দেশে জ্ঞানীর অভাব নাই, চিন্তাধারার অভাব নাই, কর্ম্মপন্থার অভাব নাই; কিন্তু যে মানুষ সকল চিন্তাকে সফল করিবে, সকল কর্ম্মকে জয়মণ্ডিত করিবে, সকল জ্ঞানকে দীপ্তিমণ্ডিত করিবে—সেই চরিত্রবান পুরুষের যেন একান্ত অভাব।

এই শক্তিমান্ পুরুষই বাঙ্গলার একমাত্র কাম্য। এই পৌরুষ লাভই সকল তরুণের স্বপ্ন। আজ বাঙ্গলার তরুণশ্রেষ্ঠের এই স্বপ্ন সকল দেশ-বাসীকে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করিয়া তুলুক—এই বাসনায় পুনরায় তরুণের স্বপ্ন প্রিয় দেশবাসীর নিকট তুলিয়া ধরিলাম। ইতি—বৈশাখ ১৩৭৫।

শ্রীগোপালদাস সান্যাল

তরুণের স্বপ্ন

আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত—একটা বাণী প্রচারের জন্য। আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিবার জন্য যদি গগনে সূর্য্য উদিত হয়, গন্ধ বিতরণের উদ্দেশ্যে বনমধ্যে কুসুমরাজি যদি বিকশিত হয়, অমৃতময় বারিদান করিতে তটিনী যদি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়—যৌবনের পূর্ণ আনন্দ ও ভরা প্রাণ লইয়া আমরাও মর্ত্ত্যলোকে নামিয়াছি একটা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যে অজ্ঞাত গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে—ধ্যানের দ্বারা, কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা।

যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে আমরা ভাসিয়া আসিয়াছি সকলকে আনন্দের আস্বাদ দিবার জন্য, কারণ আমরা আনন্দের স্বরূপ। আনন্দের

মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে আমরা মর্ত্ত্যে বিচরণ করিব। নিজের আনন্দে আমরা হাসিব—সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও মাতাইব। আমরা যেদিকে ফিরিব, নিরানন্দের অন্ধকার লজ্জায় পলায়ন করিবে, আমাদের প্রাণময় স্পর্শের প্রভাবে রোগ, শোক, তাপ দূর হইবে।

এই দুঃখসঙ্কুল, বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দ-সাগরের বাণ ডাকিয়া আনিব।

আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য্য লইয়া আমরা আসিয়াছি। আমরা আসিয়াছি সৃষ্টি করিতে, কারণ—সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ। তনু, মন-প্রাণ, বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া আমরা সৃষ্টি করিব। নিজের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শিব আছে—তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব। আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দে আমরা বিভোর হইব, সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া পৃথিবীও ধন্য হইবে।

কিন্তু আমাদের দেওয়ার শেষ নাই; কর্ম্মেরও শেষ নাই, কারণ—

"যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ;
এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর;
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"

অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অপরিমেয় তেজ ও অদম্য সাহস লইয়া আমরা আসিয়াছি—তাই আমাদের জীবনের স্রোত কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের পর্ব্বতরাজি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক,

অথবা সমবেত মনুষ্য-জাতির প্রতিকূল শক্তি আমাদিগকে আক্রমণ করুক,—আমাদের আনন্দময়ী গতি চিরকাল অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

আমাদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে—সেই ধর্ম্মই আমরা অনুসরণ করি। যাহা নূতন, যাহা সরস, যাহা অনাস্বাদিন—তাহারই উপাসক আমরা। আমরা আনিয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে। (আমরা অতীত ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা সব সময়ে মানিতে প্রস্তুত নই।) আমরা অনন্ত পথের যাত্রী বটে কিন্তু আমরা অচেনা পথই ভালবাসি—অজানা ভবিষ্যৎই আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই "the right to make blunders," অর্থাৎ "ভুল করিবার অধিকার"। তাই আমাদের স্বভাবের প্রতি সকলের সহানুভূতি নাই, আমরা অনেকের নিকট সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীহারা।

ইহাতেই আমাদের আনন্দ; এখানেই আমাদের গর্ব্ব। যৌবন সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীহারা। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি—বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্য্যন্ত অবসর আমাদের নাই। ভুল করি, ভ্রমে পড়ি, আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাৎপদ হই না। আমাদের তাণ্ডবলীলার অন্ত নাই, কারণ—আমরা অবিরামগতি।

আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সঙ্কীর্ণতা—সেইখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র

ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য রাখা, যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।

মনুষ্য জীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য। সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা চাই—সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা—যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যুগে যুগে আমরা হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি—সে স্বাধীনতা সর্ব্বতোমুখী। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্ম্মনীতি—জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক, আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।

অনাদিকাল হইতে আমরা মুক্তির সঙ্গীত গাহিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমরা যে কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠি সে ক্রন্দন শুধু পার্থিব বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য। শৈশবে ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র বল থাকে কিন্তু যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে বাহু ও বুদ্ধি আমাদের সহায় হয়। আর এই বুদ্ধি ও বাহুর সাহায্যে আমরা কি না করিয়াছি,—ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিসর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, রুশিয়া, চীন, জাপান, হিন্দুস্থান—যে কোনও দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখ—দেখিবে যে ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কীর্ত্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের সাহায্যে, সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আবার আমাদেরই অঙ্গুলিসঙ্কেতে সভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন। আমরা একদিকে প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রুরূপী তাজমহল যেমন

নির্ম্মাণ করিয়াছি, অপরদিকে রক্তস্রোতে ধরণীবক্ষও রঞ্জিত করিয়াছি। আমাদের সমবেত শক্তি লইয়া সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য কলা, বিজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে; আবার রুদ্র করালমূর্ত্তি ধারণা করিয়া আমরা যখন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছি তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে।

এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম্ম চিনিয়াছি। এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা, সব চেয়ে বড় আশা—তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে—তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে। এই যে তরুণের আন্দোলন—এটা যেমন সর্ব্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষতঃ যেখানে বার্দ্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়াছে, তরুণসম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন্ দিব্য আলোকে পৃথিবীকে ইহারা উদ্ভাসিত করিবে তাহা কে বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠো, জাগো, ঊষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে!

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

দেশের ডাক

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী বিদেশীকে ভারতের বক্ষে প্রবেশের পথ দেখিয়েছিল। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে করতে হবে। বাঙ্গলার নর-নারীকে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আন্‌তে হবে। কি উপায়ে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হতে পারে এটাই বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান সমস্যা।

জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধী অবাঙ্গালী হলেও এই আন্দোলনের সম্পর্কীয় কাজ বাঙ্গলাদেশে যে রকম প্রসার লাভ করেছে, অন্য কোনও প্রদেশে সে রকম করেনি। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ দেখার পর আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে অগ্রণী না হলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে, স্বরাজ-সংগ্রামে বাঙ্গলার স্থান সর্ব্বাগ্রে। আমার মনের মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার গুরুভার প্রধানতঃ বাঙ্গালীকে বহন করতে হবে। অনেকে দুঃখ করে থাকেন, বাঙ্গালী মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া হলো না কেন? আমি কিন্তু প্রার্থনা করি, বাঙ্গালী যেন চিরকাল বাঙ্গালীই থাকে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ"। আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি। বাঙ্গালীর পক্ষে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ। ভগবান আমাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন। অর্থের জন্য লালায়িত হয়ে যদি প্রাণের সম্পদ হারাতে হয় তবে অর্থে আমাদের প্রয়োজন নেই।

বাঙ্গালীকে এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে কেন—পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্ত্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে, আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত গড়ে তুলতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প-কলা, শৌর্য্য-বীর্য্য, ক্রীড়া-নৈপুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য—এই সবের ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীকে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করবার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় (cultural synthesis) করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙ্গালীর আছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, বাঙ্গালীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষা, দীক্ষা, স্বভাব-চরিত্র এই সবের মধ্যে বাঙ্গালীর সেই বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সবুজ শ্যামল ক্ষেত্র ও তালগাছ-ঘেরা পুষ্করিণী—এই সবের মধ্যে কি একটা বৈশিষ্ট্য নাই? আর প্রকৃতি দেবীর এই বৈশিষ্ট্য কি বাঙ্গালীর চরিত্রে একটা বিশিষ্টতা প্রদান করে নি? এমন নরম মাটিতে জন্মেছে বলেই বাঙ্গালীর এমন সরস প্রাণ! প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে বলেই

বাঙ্গালী সুন্দরের উপাসক হয়েছে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমির অন্নজল সেবন করেই বাঙ্গালী কাব্যে ও সাহিত্যে এমন অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল দেখাতে পেরেছে।

গত দুই তিন বৎসর ধরে বাঙ্গলা দেশে যে জাগরণের বন্যা এসেছিল সে বন্যা এখন ভাঁটার দিকে চলেছে বটে কিন্তু জোয়ারের আর বেশী বিলম্ব নাই। বাঙ্গলা দেশে জাতীয়তার স্রোতে আবার প্রবল বন্যা আসবে। সে বন্যার স্পর্শে বাঙ্গলার প্রাণ আবার জেগে উঠবে। বাঙ্গালী সর্ব্বস্ব পণ করে আবার স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে উঠবে; দেশ আবার স্বাধীনতা লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হবে।

এই নব জাগরণের স্বরূপ কি হবে তা' কে বল্‌তে পারে? এই নব যজ্ঞের পুরোহিত কে হবে তা' কে বলতে পারে? যে ভাগ্যবান পুরুষ এই যজ্ঞের পৌরহিত্য-ব্রত গ্রহণ করবেন তিনি এখন কোথায় বা কিরূপ সাধনায় তিনি এখন মগ্ন আছেন তা কে বলতে পারে? এই আন্দোলনের নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধী গ্রহণ করবেন অথবা কোনও নূতন মনীষী তাঁর আসনে বস্‌বেন—তা' আমরা জানি না।

এই সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য বসে থাকলে চলবে না। এই নব জাগরণের জন্য এখন থেকে আমাদের সকলকে প্রস্তুত হ'তে হবে। ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, কর্ম্ম, ত্যাগ, ভোগ—এই সবের মাঝখান দিয়ে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে—যাতে ডাক এলে আমরা সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত থাকব।

বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা

পাবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার—তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ভগবান যদি করেন, তোমরা যদি শেষ পর্য্যন্ত জীবিত থাক—তবে স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ করতে পারবে। আর যদি স্বদেশসেবার পুণ্য প্রচেষ্টায় ইহ-লীলা সম্বরণ করতে হয়, তবে মৃত্যুর স্বর্গের দ্বার তোমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে। তোমরা যদি প্রকৃত বীর সন্তান হও ত তবে এগিয়ে এসো।

হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই ত দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। আজ এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের দিনে স্বাধীনতার বাণী যখন চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে তখন কি তোমরাই ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরাই তো চিরকাল "জীবন-মৃত্যু"কে "পায়ের ভৃত্য" করে রেখেছ—তোমরাই ত সকল দেশে আত্মদানের পুণ্য ভিত্তির উপর জাতীয় মন্দির নির্ম্মাণ করেছ—তোমরাই ত যাবতীয় দুঃখ অত্যাচার সানন্দে গ্রহণ করে প্রতিদানে সেবা ও ভক্তি অর্পণ করেছ। লাভের আকাঙ্ক্ষা তোমরা রাখনি, ভয় তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বীর সৈনিকের মত তোমরা হাসতে হাসতে মরণকে আলিঙ্গন করেছ। তোমাদের শৌর্য্য, বীর্য্য ও চরিত্রবল দেখে মাতা বসুন্ধরা তোমাদের শুভ্র ললাটে জয়-টীকা পরিয়ে দিয়েছেন।

ওগো বাঙ্গলার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশ-সেবার পুণ্য যজ্ঞে আজি আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, ছুটে এসো। চারিদিকে মায়ের মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছে। ঐ যে পূর্ব্বগগনে ভারতের ভাগ্য-দেবতা তরুণ তপনের রূপে দেখা দিয়েছেন। স্বাধীনতার পুণ্য আলোক পেয়ে চীন, জাপান, তুরস্ক, মিশর

পর্য্যন্ত আজ জগৎ-সভায় উন্নতশিরে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমরা কি এখনও মোহাবেশে ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরা ওঠো, জাগো, আর বিলম্ব করলে চলবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী বণিককে গৃহপ্রবেশের পথ দেখিয়ে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা যে পাপ সঞ্চয় করে গেছেন, এই বিংশ শতাব্দীতে তোমাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ভারতের নব-জাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ মুক্তির জন্য হাহাকার করছে। তাই বলছি, তোমরা সকলে এসো, ভ্রাতৃবন্ধনের "রাখি" পরিধান করে' মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা করো যে, মায়ের কালিমা তোমরা ঘুচাবে, ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে এবং হৃত সর্ব্বস্বা ভারতলক্ষ্মীর লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য্য পুনরুদ্ধার করবে।

১১ই পৌষ, ১৩৩২

গোড়ার কথা

মানুষের জীবনে শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্য আছে, জাতীয় জীবনেও সেইরূপ ক্রমান্বয়ে এই সব অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ মরে এবং মৃত্যুর পর নূতন কলেবর ধারণ করে—জাতিও মরে এবং মরণের ভিতর দিয়ে নবজীবন লাভ করে। তবে ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে প্রভেদ এই যে, সব জাতি মৃত্যুর পর বেঁচে ওঠে না। যে জাতির অস্তিত্বের আর সার্থকতা নাই, যে জাতির প্রাণের সম্পদ একেবারে নিঃশেষ হয়েছে—সে জাতি ধরাপৃষ্ঠ থেকে লোপ পায় অথবা কীট পতঙ্গের মত কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করতে থাকে এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠার বাহিরে তার অস্তিত্বের আর নিদর্শন থাকে না।

ভারতীয় জাতি একাধিবার মরেছে—কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎ-সভায় শুনাতে হবে; ভারতের শিক্ষার (culture) মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার

প্রকৃত উন্মেষ হবে না। শুধু তাই নয়—বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য—এ সব ক্ষেত্রেও আমাদের জাতি জগৎকে কিছু দেবে ও কিছু শেখাবে। তাই ভারতের মনীষিগণ কত তমোময় যুগের মধ্যেও নির্নিমেষ নয়নে ভারতের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁদের সন্ততি আমরা, আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সফল না ক'রে কি মরতে পারি?

মনুষ্যদেহ পঞ্চভূতে মিশলেও জীবাত্মা কখনও মরে না। তদ্রূপ মৃত্যুমুখে পতিত হ'লেও জাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার ধারাই তার আত্মা; জাতির সৃষ্টিশক্তি যখন বিলুপ্ত হয় তখন বুঝতে হবে যে জাতি মরতে বসেছে। আহার, নিদ্রা ও সন্তানোৎপাদন তখন তার কার্য্যতালিকা হ'য়ে দাঁড়ায় এবং গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করাই তার একমাত্র নীতি ব'লে পরিগণিত হয়। এ অবস্থায় পড়েও কোনও কোনও জাতি আবার বেঁচে ওঠে, যদি তার অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে। অন্ধকারময় যুগ যখন জাতিকে এসে গ্রাস করে, তখন সে কোনও প্রকারে নিজের শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার ধারা বাঁচিয়ে রাখে, অন্য জাতির সঙ্গে মিশে ভুত হয়ে যায় না। তারপর অদৃষ্ট বা ভগবানের ইঙ্গিতে আবার নব জাগরণ দেখা যায়। অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হয়; প্রসুপ্ত জাতি আবার চোখ খোলে; তার সৃষ্টি-শক্তি ফিরে আসে। সহস্রদল পদ্মের মত জাতির প্রাণ-ধর্ম্ম আবার ফুটে ওঠে এবং নব নব রূপে, নব নব ভাবে ও নব নব দিকে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এরূপ অনেক মৃত্যু ও জাগরণের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জাতি চলে এসেছে, কারণ ভারতের একটা mission আছে,—ভারতীয় সভ্যতার একটা উদ্দেশ্য আছে যাহা আজও সফল হয় নাই।

ভারতের এই mission-এ যার বিশ্বাস আছে—সেই ভারতবাসীই শুধু বেঁচে আছে। ভারতের তেত্রিশ কোটী লোক যে বাঁচার মত বেঁচে আছে এ-কথা সত্য নহে। ভারতের এবং বাঙ্গলার তরুণদের এই বিশ্বাস আছে—তাই তারা বেঁচে আছে।

দেশান্তরে কারাবাসে মাসের পর মাস যখন কাটিয়েছি তখন প্রায়ই এই প্রশ্ন আমার মনে উঠত—"কিসের জন্য, কিসের উদ্দীপনায় আমরা কারাবাসের চাপে ভগ্নপৃষ্ঠ না হয়ে আরও শক্তিমান হয়ে উঠছি?" নিজের অন্তরে যে উত্তর পেতাম তার মর্ম্ম এই:—"ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্ত্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি। এই অটল, অচল বিশ্বাস আছে বলেই বাঙ্গলার তরুণ শক্তি মৃত্যুঞ্জয়।"

এই "শ্রদ্ধা," এই আত্মবিশ্বাস যার আছে সেই ব্যক্তিই সৃষ্টিক্ষম, সেই ব্যক্তিই দেশ-সেবার অধিকারী। জগতে মহৎ প্রচেষ্টা যাহা কিছু আছে তাহা মনুষ্যহৃদয়ের আত্ম-বিশ্বাস ও সৃষ্টিশক্তির প্রতিচ্ছায়া মাত্র। নিজের এবং জাতির উপর বিশ্বাস যার নাই, সে ব্যক্তি কোন্ বস্তু সৃষ্টি করতে পারে?

বাঙ্গালীর অনেক দোষ আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর একটা গুণ আছে যাতে তার অনেক দোষ ঢাকা পড়েছে এবং যার বলে সে আজ জগতের মধ্যে মানুষ বলে গণ্য। বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাস আছে, বাঙ্গালীর

ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাশক্তি আছে—তাই বাঙ্গালী বর্ত্তমান বাস্তব জীবনের সকল ত্রুটি, অক্ষমতা, অসাফল্যকে অগ্রাহ্য ক'রে মহান আদর্শ কল্পনা করতে পারে—সেই আদর্শের ধ্যানে ডুবে যেতে পারে এবং আপাতদৃষ্টিতে যাহা অসাধ্য, তাহা সাধন করবার চেষ্টা করতে পারে। এই কল্পনা শক্তি ও আত্মবিশ্বাস আছে বলেই বাঙ্গলা দেশে এত সাধক জন্মেছে এবং এখনও জন্মাবে। এই কারণে দুঃখ কষ্ট ও অত্যাচারের চাপে বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড কখনও ভাঙ্গবে না। যে জাতির idealism (আদর্শ-প্রীতি) আছে সে জাতি তার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রণাক্লেশ সানন্দে বরণ করে নিতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে, suffering-এর (দুঃখ) মধ্যে বুঝি শুধু কষ্টই আছে, কিন্তু এ কথা সত্য নয়। Suffering-এর মধ্যে কষ্ট যেমন আছে—তেমনি একটা অপার আনন্দও আছে। এই আনন্দবোধ যার হয় নি তার কাছে কষ্ট শুধু কষ্টই; সে ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের নিষ্পেষণে অভিভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্টের ভিতর একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে—তার কাছে suffering একটা গৌরবের জিনিষ, সে দুঃখ কষ্টের চাপে মুমূর্ষু না হয়ে আরও শক্তিমান ও মহীয়ান হয়ে ওঠে। এখন জিজ্ঞাস্য বিষয় এই—"আনন্দের উৎস কোথায়?" ঘন ঘটাচ্ছন্ন অমানিশায় যে বিজলী চমকায়, তার উৎপত্তি কোথায়?" আমার মনে হয়, এই আনন্দের উৎপত্তি আদর্শানুরাগ থেকে। যে ব্যক্তি কোনও মহান আদর্শকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার দরুণ দুঃখ যন্ত্রণা পায়, তার কাছে দুঃখ ক্লেশ অর্থহীন নয়। দুঃখ তার কাছে রূপান্তরিত হয়ে আনন্দ ব'লে প্রতীয়মান হয় এবং সেই আনন্দ অমৃতের মত তার শিরায় শিরায় শক্তি সঞ্চার করে দেয়। আদর্শের চরণে যে

আত্মসমর্পণ করতে পারে, সে-ই কেবল জীবনের অর্থ বুঝতে পারে এবং জীবনের অন্তর্নিহিত রসের সন্ধান পেতে পারে।

গত এপ্রিল মাসে ইনসিন জেলে একটি রুশীয় উপন্যাস পড়তে পড়তে ঠিক এই ভাবের প্রতিধ্বনি পেলাম। লেখক একজন নায়কের মুখ দিয়ে রুশ জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন:—

There is still much suffering in store for the people, much of their blood will yet flow, squeezed out by the hands of greed ; but for all that, all my suffering, all my blood is a small price for that which is already stirring in my breast, in my mind, in the marrow of my bones ! I am already rich as a star is rich in golden rays. And I will bear all, will suffer all because there is within me a joy which no one, nothing can ever stifle ! In this joy there is a world of strength !

[আমাদের কপালে এখনও অনেক কষ্ট আছে; লোভী ও অত্যাচারীদের নিষ্পেষণে আমাদের অনেক রক্ত এখনও বইবে। তথাপি যে সত্য আমার চিত্তে, হৃদয়ের অন্তরে ও অস্থি মজ্জার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে, তা পাবার জন্য যদি আমাকে সকল দুঃখকষ্ট ভোগ ও আমার সমস্ত রক্ত দান করতে হয়, তাহ'লেও বুঝব যে, অতি অল্প মূল্যে এতবড় সম্পত্তি পেয়েছি! সোণার কিরণমণ্ডিত তারকার মত আমার আজ ঐশ্বর্য্য! তাই আমি সকল যন্ত্রণা ক্লেশ সহ্য করব, সব দুঃখকষ্ট আমার বুকের মধ্যে

টেনে নিব, কারণ আমি অন্তরে যে আনন্দ পেয়েছি তাকে পার্থিব কোনও বস্তুই চেপে রাখতে পারে না! এই আনন্দই অনন্ত শক্তির আকর!]

নীলকণ্ঠকে আদর্শ করে যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমার মধ্যে আনন্দের উৎস খুলে গেছে, তাই আমি সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারি; যে ব্যক্তি বলতে পারে—আমি সব যন্ত্রণা ক্লেশ মাথায় তুলে নিচ্ছি, কারণ এর ভিতর দিয়ে আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি—সেই ব্যক্তিই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে।

আমাদের আজ এই সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে। নূতন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে—সারাজীবন কেবল দিয়ে যেতে হবে—নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কাঙ্গাল হয়ে যেতে হবে—প্রতিদানে কিছু না চেয়ে। নিঃশেষে জীবন দান করেই জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যারা এরূপ সাধক হবে তাদের সম্পদ থাকবে কেবল অন্তরের আত্মবিশ্বাস, আদর্শানুরাগ ও আনন্দবোধ।

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার ছাত্রস্থানীয় একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে আমাকে কতকগুলি নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অবিশ্বাসপূর্ণ প্রশ্ন করে। তার প্রশ্নের ভাব এই, আমাদের দেশের কিছুতেই কিছু হবে না। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবার পর সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—কাউন্সিলে গিয়ে, গভর্ণমেন্টকে বাধা প্রদান ক'রে ও মন্ত্রীদের তাড়িয়ে কি হবে? আমি উত্তরে বললাম—এসব না ক'রেই বা কি হবে? তার পর তার অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাবকে লক্ষ্য করে আমি বললাম—"দেখ, তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম; আদর্শের প্রেরণায় তোমরা অসহযোগের পথে নেমেছ। আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমার idealism (আদর্শানুরাগ) বেড়ে চলেছে, কিন্তু তোমার idealism

দেখছি দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ছে।” তখন সে স্বীকার করলে যে, গত কয়েক বৎসরে নানা প্রকার আঘাত পেয়ে তার এরূপ ভাবান্তর হয়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, গত দুই বৎসরে একটা সাময়িক অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব বাঙ্গলাদেশকে ছেয়ে ফেলেছে। এর ফলে আমাদের কর্ম্মশক্তি কতকটা পঙ্গু হয়ে পড়েছে কিন্তু জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলবার সময় এসেছে। অন্তরের শত্রুর চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর হতে পারে না। তাই অবিশ্বাসরূপ গৃহশত্রুকে সর্ব্বাগ্রে জয় করতে হবে, তা হ'লেই বাইরের শত্রুকে আমরা জয় করতে পারব। আজ বাঙ্গালীকে আবার দুর্জ্জয় আত্মবিশ্বাস লাভ করতে হবে। আদর্শে বিশ্বাস, নিজের শক্তিতে বিশ্বাস, ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যতে বিশ্বাস—এই বিশ্বাসের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের বিশ্ববিজয়ী হতে হবে।

বাঙ্গালাদেশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করলে দুই কারণে খুব আশা হয়ঃ—(১) ব্যায়াম চর্চ্চা ও ভূপর্য্যটনের স্পৃহা (২) তরুণের জাগরণ। কাপুরুষ ব'লে বাঙ্গালীর একদিন পৃথিবীতে অপবাদ ছিল—সে অপবাদ এখন গেছে। বাঙ্গালীর পরম শত্রু যিনি, তিনিও বোধ হয় এখন বাঙ্গালীকে সে অপবাদ দিতে সাহসী হবেন না। এই কাপুরুষতার অপবাদ কে দিয়েছিল এবং কি উপায়ে সে অপবাদ বিদূরিত হয়েছে তা বাঙ্গালীমাত্রেই জানে—এখানে তার উল্লেখ করবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু শারীরিক দুর্ব্বলতার অপবাদ এখনও আছে—সে অপবাদ বাঙ্গালীকে দূর করতে হবে। বাঙ্গালী যে আজ এই অপবাদ দূর করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে চতুর্দ্দিকে সমিতির প্রতিষ্ঠা চলেছে—ইহা বড় আনন্দের বিষয়। এই অপবাদ যদি চিরকালের তরে দূর করতে হয় তবে

বাঙ্গালীকে জাতিহিসাবে সবল ও বীর্য্যবান হতে হবে। কয়েকজন ভুবনবিজয়ী পালোয়ান সৃষ্টি করলেই এ উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। কারণ এরূপ পালোয়ানের শক্তি ও শৌর্য্যের গুণে জাতির গৌরব বৃদ্ধি হলেও সাধারণ বাঙ্গালীর শক্তি বৃদ্ধি হবে না। জাতি-বিশেষের বিচার করতে হ'লে শুধু তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের দেখলে চলবে না—সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকেদের দিকেও তাকাতে হবে।

বাঙ্গালীর যে আজকাল ভুপর্য্যটনের স্পৃহা জেগে উঠেছে,এটা সবচেয়ে আনন্দদায়ক। বাঙ্গালী যে আজ ঘরের কোণ ত্যাগ করে পায়ে হেঁটে, সাঁতার দিয়ে, সাইকেলে চড়ে দেশ বিদেশে ভ্রমণে বাহির হবে, বিশ বৎসর পূর্ব্বে কে এ কথা বিশ্বাস কর'ত? অজানা দেশ দেখবার, অজানা পথে হাঁটবার, অজানা লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার, এই যে ব্যাকুলতা—এর থেকেই জাতিগঠন ও সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে সব জাতি স্বীয় গণ্ডীর বাইরে যেতে চায় না বা যেতে অপারগ—তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। অপর দিকে যে সব জাতি বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করেও প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে, তাদের দিন দিন দৈহিক ও মানসিক উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তার হয়ে থাকে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গেয়েছিলেন—"আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি"—তখন তিনি আমাদের সামনে ভ্রান্ত আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন। আমাদের এখন বলবার সময় এসেছে—

"আমি যাব না, যাব না, যাব না ঘরে
বাহির করেছে পাগল মোরে।"

ঘরের কোণ ছেড়ে আমাদের এখন বিশ্বের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হবে—নিজেদের দেশটাকে প্রত্যক্ষভাবে ভাল করে দেখতে হবে; তারপর

দেশের সীমানা ছাড়িয়ে দেশান্তরে ভ্রমণ করতে হবে এবং অজানা অপরিচিত দেশ আবিষ্কার করতে হবে। যে জাতি এরূপ করতে পারে তার শারীরিক বল, সাহস, চরিত্রবল, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-বিস্তার ও সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। ব্রিটিশ জাতি যে আজ এত উন্নত এবং তারা যে এত বড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছে, তাদের প্রবল ভ্রমণেচ্ছা তার অন্যতম কারণ। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আমরা পোষণ না করলেও দেশ-বিদেশে ঘুরলে আমাদের হৃদয়টা যে বড় হবে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যে বেড়ে যাবে, আত্মবিশ্বাস যে বলবান্ হবে, বুদ্ধিবৃত্তি যে বিকাশ লাভ করবে—এ বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ আছে? তবে ভূপর্য্যটন থেকে ষোল আনা লাভ গ্রহণ করতে হলে প্রভূত ধনশালী আধুনিক আমেরিকান ভূপর্য্যটকদের মত না বেড়িয়ে যতদূর সম্ভব কষ্ট স্বীকার করে পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চেপে, সাইকেলে চড়ে বেড়াতে হবে।

আর একটা বড় আশাপ্রদ লক্ষণ এই যে, আজকাল প্রায় সব জেলায় যুবকদের মধ্যে একটা আন্দোলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই চাঞ্চল্যই জীবনী-শক্তির স্পন্দন। তরুণদের প্রাণ জেগেছে, তারা এখন নিজেদের কর্ত্তব্য বুঝতে আরম্ভ করেছে—তাই এত জায়গায় যুবক-সমিতির অধিবেশন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে শুনতে পাওয়া যায় যে তরুণরা কাজ করতে প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু তারা পথ ঠিক বুঝতে পারছে না। কেউ কেউ বলেন যে, নেতার অভাবে যুবকেরা কিছু করে উঠতে পারছে না। নেতা খুঁজে না পেলেও এবং পথ ঠিক বুঝতে না পারলেও তরুণরা যে জেগেছে এবং স্বীয় কর্ত্তব্য ও স্বীয় দায়িত্ব বুঝবার চেষ্টা করছে, এটা কম কথা নয়। এখন আমার বক্তব্য এই—নেতা যদি খুঁজে নাও পাও—তবে কি তোমরা চুপ করে বসে থাকবে? তোমরাই

নেতা সৃষ্টি করে নিয়ে কাজে লেগে যাও। নেতা আকাশ থেকে পড়ে না—কাজের মধ্যে দিয়ে নেতা গড়ে ওঠে। তার পর—"কঃ পন্থা?" ব'লে তোমরা যে মাথায় হাত দিয়ে বসেছ—তা করলে চলবে না। নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির আলোকে তোমরা নিজেরাই পথ আবিষ্কার কর। সমস্যাটা যত জটিল মনে কর, ততটা জটিল নয়। আমাদের আদর্শ এই যে, আমরা একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জাতি গড়ে তুলতে চাই—যে জাতি জ্ঞান ও কর্ম্মে, শিক্ষা ও ধর্ম্মে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন জাতিদের পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে। অতএব জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জাগরণ আনতে হবে। কোনও দিকটা বাদ দিলে চলবে না। যার যেরূপ শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা, তাকে তদনুরূপ কর্ম্মক্ষেত্র ঠিক করে নিতে হবে। যার যেরূপ জন্মলব্ধ বা ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা—তাকে সেই ক্ষমতাই ফুটিয়ে তুলে দেশমাতৃকার চরণে তাহা অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করতে হবে।

গত বিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে অনেক সাধক, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানবিদ, কর্ম্মবীর ও জননায়ক আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে দেশবাসীকে চোখের জলে ভাসিয়ে, পরলোক গমন করেছেন। তাঁহাদের পরিত্যক্ত স্থানের মধ্যে অনেকগুলি এখনও কেউ দখল করতে পারেন নাই। এটা কি বাঙ্গালীর পক্ষে কম লজ্জার কথা? বাঙ্গালী যদি বেঁচে থাকে তবে এই শূন্য স্থানের মধ্যে অধিকাংশগুলি যাতে শীঘ্র অধিকৃত হয় তার জন্য মানুষের সৃষ্টি হওয়া উচিত। জাতি যতদিন প্রকৃতপক্ষে বেঁচে থাকে ততদিন শূন্য স্থানগুলি এমন ভাবে পড়ে থাকে না—মহাপুরুষদের অন্তর্ধানের পর নূতন মনীষিগণ এসে তাঁদের স্থান অধিকার করেন। যে জাতি অনন্যমনা হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনায় নিরত থাকে—সে জাতির মধ্যে

কোনও দিকেই প্রকৃত মানুষের অভাব কখনও হয় না। বাঙ্গলার সাধনা এখনও পূর্ণাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই—সেইজন্য মনীষী বা নায়কের প্রস্থানের পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আসন অধিকৃত হয় না !

সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন জাতিকে চোখের সামনে রেখে জাতীয় সাধনায় প্রবৃত্ত না হলে—সে সাধনা কখনও জয়যুক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হবে না। জাতীয় জীবনের বহুদিক আছে—সব দিক দিয়েই জাতিকে গড়ে তুলতে হবে। প্রাণের বন্যা যখন জাতির শরীরে প্রবেশ করবে তখন সব দিক দিয়েই তার বিকাশ হওয়া চাই। তা না হলে যে বস্তুর সৃষ্টি হবে তা কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না।

তরুণ বাঙ্গলাকে আত্মস্থ হতে হবে। বাহ্য শক্তির উপর নির্ভর না করে তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। নূতন জাতি সৃষ্টির দায়িত্ব আজ তরুণ সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত। এত বড় দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে হলে জীবন পণ করে সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে। আশার কথা এই যে, চারিদিকে এই সাধনার বিপুল আয়োজন চলছে। এই বিরাট যজ্ঞে শুধু আমরাই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব ? তা হতেই পারে না ; তাই বলি—হে আমার তরুণ জীবনের দল ! এসো, আমরাও এই বাণী উচ্চারণ করে বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হই—

"মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্ শরীরং বা পাতয়েয়ম্"

আশ্বিন, ১৩৩৩।

পত্রাবলী

"তোমারি লাগিয়ে কলঙ্কের বোঝা
বহিতে আমার সুখ"

[মান্দালয় জেল হইতে দক্ষিণ-কলিকাতা সেবক-সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্তকে ১৯২৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে লিখিত।]

মান্দালয় জেল

ডিসেম্বর, ১৯২৬

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ৯ই নভেম্বরের পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হল ব'লে মনে কিছু করবেন না। নিজের ইচ্ছা অনুসরণ করলে হয়তো পত্র দিতুম না, কারণ রাজবন্দীর সহিত সম্বন্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় নহে। তবে আপনি বোধহয় উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছেন এবং উত্তর পেয়ে সুখী হবেন—এই মনে ক'রে উত্তর দিতে বসেছি।

আপনারা যে সমবেতভাবে আমার কথা স্মরণ করে আমার স্বাস্থ্য ও মুক্তি কামনা করেছেন এবং হৃদয়ের সম্ভাষণ আমাকে জানিয়েছেন, তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানবেন। এর চেয়ে বড় পারিতোষিক কোন স্বদেশসেবী কামনা করতে পারে না। তাই আপনার পত্র পেয়ে এবং খবরের কাগজে আপনাদের সভার বিবরণ পাঠ ক'রে আমি যে আনন্দ পেয়েছি তা বলা বাহুল্য। তবে আমি বুঝি যে, এই

আনন্দ পাওয়াটা খুব উচ্চ স্তরের মনের নিদর্শন নয়। কি করি! স্বদেশ-সেবী হবার স্পর্দ্ধা রাখলেও আমি মানুষ। ভালবাসা প্রীতি ও করুণার নিদর্শন পেলে কে না সুখী নয়? পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটী জয় অথবা অতিক্রম করতে পারলেই ভাল হয়। উচ্চ স্তরের কর্ম্মীর পক্ষে সকল প্রকার প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা জয় করা উচিত, কিন্তু সেটা এখনও আমার কাছে আদর্শ মাত্র। বুকে হাত দিয়ে বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে, Alexander Selkirk-এর ভাষায় আমারও সময় সময় মনে হয়—

"My friends do they now and then
Send a wish or a thought after me.

.........ইত্যাদি।

আজ ঠিক চৌদ্দমাস আমি জেলে। এর মধ্যে এগার মাস কাটলো সুদূর ব্রহ্মদেশে। সময়ে সময়ে মনে হয় যে, দীর্ঘ চৌদ্দমাস দেখতে দেখতে গেল; কিন্তু অন্য সময়ে মনে হয় যেন কত যুগ ধ'রে এখানে রয়েছি। এ যেন আমার ঘর-বাড়ী; কারাগারের বাহিরের কথা যেন স্বপ্নের মত, প্রহেলিকার মত বোধ হয়; যেন ইহজগতে একমাত্র সত্য হচ্ছে লৌহের গারদ ও প্রস্তরের প্রাচীর! বাস্তবিক এ একটা নূতন বিচিত্র রাজ্য! আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, যে জেলখানা দেখে নাই সে জগতের কিছুই দেখে নাই। তার কাছে জগতের অনেক সত্য প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। আমি নিজের মনকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, এইরকম চিন্তা ঈর্ষা-প্রসূত নয়। আমি প্রকৃতপক্ষে জেলখানায় এসে অনেক শিখেছি; অনেক সত্য যাহা একসময় ছায়ার মত ছিল, এখন আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে, অনেক নূতন অনুভূতিও আমার জীবনকে সবল ও গভীর ক'রে তুলেছে। যদি ভগবান কোনও দিন সুযোগ দেন

ও মুখে ভাষা দেন—তবে সে সব কথা দেশবাসীকে জানাবার আকাঙ্ক্ষা ও স্পর্দ্ধা আছে।

জেলে আছি—তাতে দুঃখ নাই। মায়ের জন্যে দুঃখভোগ করা সে ত গৌরবের কথা! Suffering-এর মধ্যে আনন্দ আছে, এ কথা বিশ্বাস করুন। তা না হলে লোক পাগল হয়ে যেত, তা না হলে কষ্টের মধ্যে লোক হৃদয়ের আনন্দে ভরপুর হয়ে হাসে কি করে? যে বস্তুটা বাহির থেকে Suffering ব'লে বোধ হয়—তার ভিতর থেকে দেখলে আনন্দ বলেই বোধ হয়। অবশ্য বৎসরের মধ্যে ৩৬৫ দিন এবং দিনের মধ্যে ২৪ ঘন্টা এ ভাব আমার থাকে না, কারণ—এখনও শৃঙ্খলের দাগ গায়ের উপর রয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই অনুভূতি অল্পাধিক ভাবে যার নাই, সে না পারে Suffering-এর দ্বারা জীবনকে পরিপুষ্ট করতে, না পারে suffering-এর মধ্যে প্রকৃতিস্থ থাকতে।

আমার দুঃখ শুধু এই যে, চৌদ্দমাস কাল অনেকটা হেলায় কাটিয়েছি। হয়তো বাঙ্গলার জেলে থাকলে এই সময়ের মধ্যে সাধনার পথে অনেকটা এগুতে পারতুম। কিন্তু তা হবার নয়! এখন আমার প্রার্থনা শুধু এই, "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।" যখনই খালাসের কল্পনা করি তখন আনন্দ যত হয়, তার চেয়ে বেশী হয় ভয়। ভয় হয় পাছে প্রস্তুত হতে না হতে কর্ত্তব্যের আহ্বান এসে পৌছায়। তখন মনে হয়, প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত যেন খালাষের কথা না উঠে। আজ আমি অন্তরে-বাহিরে প্রস্তুত নই, তাই কর্ত্তব্যের আহ্বান এসে পৌছায় নাই। যেদিন প্রস্তুত হব সেদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে কেহ আটকে রাখতে পারবে না।

এসব ভাবের কথা; এর মধ্যে objective truth আছে কি না

জানি না। জেলখানায় থাকতে থাকতে subjective truth এবং objective truth এক হয়ে যায়। ভাব ও স্মৃতি যেন সত্যে পরিণত হয়ে পড়ে। আমার অবস্থা অনেকটা তাই। আপাততঃ ভাবই আমার কাছে বাস্তব সত্য ; কারণ একত্ববোধের মধ্যেই শান্তি।

আপনি লিখেছেন, "দেশের ও কালের ব্যবধান আপনাকে বাঙ্গলা দেশের নিকট আরও প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।" কিন্তু দেশের ও কালের ব্যবধান সোনার বাঙ্গলাকে আমার কাছে কত সুন্দর, কত সত্য ক'রে তুলেছে তা আমি বলতে পারি না। ৺দেশবন্ধু তাঁর বাঙ্গলার গীতি-কবিতায় বলেছেন 'বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটীর মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে।' এ উক্তির সত্যতা কি এমন ভাবে বুঝতে পারতুম, যদি এখানে এক বৎসর না থাকতুম? "বাঙ্গলার ঢেউ খেলানো শ্যামল শস্য ক্ষেত্র, মধু-গন্ধবহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে-মন্দিরে ধূপ-ধুনা-জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর প্রাঙ্গন"—এ সব দৃশ্য কল্পনার মধ্য দিয়াও কত সুন্দর!

প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়েকটী বঙ্গ-জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ ব'লে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়—

'তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা,
বহিতে আমার সুখ।'

সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড

রূপান্তর লাভ ক'রে দিবালোক সৃষ্টি করে—তখন মনে পড়ে সেই বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সূর্য্যাস্তের দৃশ্য। এই কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য্য রয়েছে তা কে পূর্ব্বে জানত!

প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যখন দিঙ্মণ্ডল আলোকিত ক'রে এসে নিদ্রালস নয়নের পর্দ্দায় আঘাত ক'রে বলে, "অন্ধ জাগো"—তখনও মনে পড়ে আর একটা সূর্য্যোদয়ের কথা, যে সূর্য্যোদয়ের মধ্যে বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গলার সাধক বঙ্গ-জননীর দর্শন পেয়েছিল।

থাক—আমি বোধ হয় pedantic হ'য়ে পড়েছি। তবে এটা pedantry নয়—বাচালতা। ভাবের আদান প্রদান বহুদিন বন্ধ থাকলে যা হয়—তারই একটা দৃষ্টান্ত। Engine যেমন মধ্যে মধ্যে তার খানিকটা steam ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করে—আমার অবস্থাও তদ্রূপ।

সেবক-সমিতির কাজ ভাল চলছে শুনে সুখী হলুম। Lansdowne branch-এর সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটা উচিত নয়। আশা করি, তাঁরা কাজকর্ম্ম ভাল করছেন। দক্ষিণ-কলিকাতা সেবাশ্রমের Orphanage-এর জন্য যদি কিছু করতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এটার তেমন উন্নতি হচ্ছে না বোধ হয়—অথচ কাজটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আপনাকে চিনিতে আমার কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। আশা করি আপনাদের সকলের কুশল। আমার প্রীতিসম্ভাষণ ও আলিঙ্গন গ্রহণ করবেন। ইতি—

সমাজ-সেবা ও কুটীর-শিল্প

১

[দক্ষিণ-কলিকাতা সেবক-সমিতির সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বিশ্বাসের নিকট মান্দালয় জেল হইতে লিখিত পত্রগুলি অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিয়া প্রকাশিত হইল।]

মান্দালয় জেল

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া ও সকল সমাচার অবগত হইয়া আনন্দিত হইলাম। কার্য্যকরী সমিতির খুব বেশী সভ্য সেবাশ্রমের কাজের দিকে দৃষ্টি দেন না বলিয়া আপনারা নিরাশ বা চিন্তিত হইবেন না। অধিকাংশ কার্য্যকরী সমিতিরই এইরূপ অবস্থা। আপনাদের নিজেদের সেবা ও আগ্রহাতিশয্যের দ্বারায় অপরের আগ্রহ ও সেবাপ্রবৃত্তি জাগাইতে হইবে। গ্রামের মধ্যে অপরের দুঃখে সমবেদনা ও সহানুভূতি না জাগিলে সেবা-কার্য্য সম্ভবপর হয় না। অন্ততঃ সম্ভবপর হইলেও সার্থক হয় না। আপনাদের আত্যন্তিক সেবা ও জনপ্রীতির ফলে সমাজে অপরের হৃদয়েও তাদৃশভাব জাগরিত হইবে—ইহাই আমার ভরসা ও আকাঙ্ক্ষা।

সেবাশ্রমের বাড়ীর সঙ্গে বাগান করিবার মত জমি আছে কি?

মাসিক ১৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা আদায় হয় শুনিয়া সুখী হইলাম। বাড়ী-ভাড়া এখন কত দিতে হয়? বাড়ী কয় তালা এবং মোট কয়খানা ঘর আছে? কর্পোরেসনের প্রাইমারি স্কুলে কয়জন ছাত্র হয় এবং কোন জাতির ছাত্র পড়িতে আসে? সেবাশ্রমের বালকদের কি শিক্ষা দেওয়া

হয় তার বিস্তৃত বিবরণ আমাকে পাঠাইবেন, সেবাশ্রমের কোনও চাকর আছে কিনা এবং থাকিলে কয়জন চাকর আছে তাহা জানাইবেন। দৈনিক রন্ধন কে করে? বালকদের মধ্যে কয়জন তাঁতের ও Sewing machine-এর কাজ শিখিতেছে? কত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একটী বালক কাপড় বুনিতে ও সেলাইর কাজ (মোটামুটি কোট ও পাঞ্জাবী তৈয়ারী করা) শিখিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করেন?

বালকদের average inteligence কি রকম? সেবাশ্রম সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইবেন, আমি তাহা পড়িয়া কিছু পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিব। বালকদের আহারের কি রকম ব্যবস্থা আছে তার বিস্তৃত বিবরণও পাঠাইবেন। অসুখ-বিসুখ হইলে চিকিৎসার কিরূপ ব্যবস্থা আছে? চিকিৎসা বা ঔষধের জন্য খরচ লাগে কি না? ইতি—

২

মান্দালয় জেল

আপনি বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে, আমাদের অনশন-ব্রত একেবারে নিরর্থক বা নিষ্ফল হয় নাই। গভর্ণমেন্ট আমাদের ধর্ম্ম বিষয়ে দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অতঃপর বাঙ্গলা দেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাৎসরিক ত্রিশ টাকা allowance পাইবেন। ত্রিশ টাকা অতি সামান্য এবং ইহা দ্বারা আমাদের খরচ কুলাইবে না; তবে যে principle গভর্ণমেন্ট এতদিন স্বীকার

করিতে চান নাই তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সব চেয়ে বড় লাভ—টাকার কথা সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্বকালে অতিতুচ্ছ কথা। পূজার দাবী ছাড়া আমাদের অন্যান্য অনেকগুলি দাবীও গভর্ণমেন্ট পূরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ভাষায় কিন্তু বলিতে গেলে আমাকে বলিতে হইবে "ইহ বাহ্য"। অর্থাৎ অনশন-ব্রতের সব চেয়ে বড় লাভ, অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ লাভ—দাবীপূরণের কথা বাহিরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। Suffering ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থির নিশ্চিন্ত ভাবে বলিতে পারে না, তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরও ভালভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়াছে।

* * * *

Social Service-এর ভিতর দিয়া গৃহ-শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে। Commercial Museum, Bengal Home Industries Association প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বা দোকান ঘুরিয়া দেখিলে আমাদের মনে নূতন ভাব আসিতে পারে। বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের শিল্প-বিভাগের বাৎসরিক বিবরণী (Administration Report of the Department of Home Industries) কয়েক বৎসর পাঠ করিলেও উপকার হইতে পারে। সর্ব্বোপরি যেখানে গৃহশিল্প চলিতেছে সেখানে গিয়া স্বচক্ষে কার্য্যপ্রণালী দেখা ও শিক্ষা করা প্রয়োজন। কুটীর-শিল্প. চালাইতে হইলে যে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা আমার মনে হয় না। সর্ব্ব প্রথমে আমাদের দরকার সভ্যদের

মধ্যে অন্ততঃ একজন ভদ্রলোক পাওয়া যিনি শুধু এই বিষয়ে চিন্তা করিবেন, খবর লইবেন এবং পুস্তকাদি পড়িবেন। তারপর যে সব কুটীর-শিল্প চালাইবার কিছু সম্ভাবনা আছে তিনি সেগুলি নিজে দেখিয়া আসিবেন। যখন শেষে কুটীর-শিল্পবিশেষ চালাইবার প্রস্তাব স্থির হইবে তখন কর্ম্মীকে পাঠাইয়া কাজ শিখাইয়া লইতে হইবে। Polytechnic Institute-এ আগাগোড়া কাহাকেও পড়াইবার প্রয়োজন দেখি না। Electroplating প্রভৃতি শিল্প সেখানে শিখিবার কোন প্রয়োজন আমি দেখি না। কারণ সেলাই-এর বিভাগ আমাদের নিজেদেরই আছে এবং কামারের কাজ অথবা Electroplating-এর কাজ আপাততঃ সমিতির কর্ম্মীকে শিখাইয়া কোনও লাভ হইবে না। আমার যতদূর স্মরণ আছে (আমি মাত্র একবার Polytechnic-এ গিয়াছি) Polytechnic-এর সমস্ত শিল্পের মধ্যে একমাত্র বেতের কাজ অথবা মাটীর পুতুলের কাজ আমরা কুটীর-শিল্প হিসাবে চালাইতে পারি—ইহার মধ্যেও আমি বেতের কাজ সম্বন্ধে কতকটা সন্দিহান, কারণ স্ত্রীলোকদের দ্বারা একাজ আমরা করাইতে পারিব কি না ঠিক বলিতে পারি না। এখন যদি শেষে মাটীর পুতুলের কাজ চালাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে যে-কোনও কর্ম্মী কয়েকদিনের মধ্যেই এ-কাজ শিখিয়া আসিতে পারে। খরচ কিছুই লাগিবে না এবং আমরা যখন কুটীর-শিল্প আরম্ভ করিব তখন মাত্র রংএর জন্য কিছু নগদ টাকা খরচ হইবে। ইহা ব্যতীত আর খুব কম খরচই লাগিবে। মোট কথা, একজনকে শুধু এই সমস্যা লইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে—He must become mad over it.

আর একটা কথা আমার বার বার মনে আসে—পূর্ব্বেও বোধ হয় এ

বিষয়ে লিখিয়াছি—ঝিনুকের বোতাম তৈরী করা। ঢাকা জেলার অনেক গ্রামে এই শিল্প ঘরে ঘরে চলিতেছে। গরীব গৃহস্থের বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষেরা তাহাদের অবসর সময়ে এই কাজ করিয়া থাকে। একজন কর্ম্মীকে খুব অল্পদিনের মধ্যে এই কাজ শিখান যাইতে পারে। অথবা এই কাজ জানে এবং শিখাইতে পারে এমন একজন নূতন কর্ম্মীকে আপনারা নিযুক্ত করিতে পারেন।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া আপনারা এরূপ কর্ম্মীকে আকর্ষণ করিতে পারেন। আমার নিজের মনে হয় যে, পাথরের গায়ে ঘসিয়া বোতাম তৈরী করা যায়—আমরা নিজেরা ইচ্ছা করিলে তৈয়ার করিতে পারি। শুধু সরু যন্ত্র একটা থাকিলে গর্ত্ত করা যায় এবং হয় তো গোল করিয়া কাটিবার জন্য একটা ধারাল যন্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে। সমিতি হইতে কয়েকটা যন্ত্র এবং এক বস্তা ঝিনুক আনাইয়া দিলে কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন। কাজটা সাহায্য-প্রার্থীদের মধ্যে আবদ্ধ হইবে কিন্তু একবার কৃতকার্য্য হইলে দেখিবেন যে, সাধারণ গরীব গৃহস্থেরা নিজেদের আয় বাড়াইবার জন্য এই কাজ আরম্ভ করিবে। সমিতি শুধু সস্তা দরে raw materials প্রভৃতি জোগাইবে এবং প্রস্তুত জিনিষ বেশী দরে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিবে। এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথম দিকটা খুব বেশী সময় দিতে হইবে। ইতি—

আপনি পূর্ব্বে যে সব কাগজ পাঠাইয়াছিলেন, (মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা-পত্র, দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য যে সম্মিলনী হইয়াছিল তাহার কার্য্যসূচী ইত্যাদি) তাহা যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। গত কাল আবার আপনার প্রেরিত লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা (Variety Entertainment-এর কার্য্যসূচী ইত্যাদি) পাইয়াছি। সমিতির কাজ যে দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে, তাহাতে আমি যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না।

* * *

আপনারা যে খরচ বাদে এত টাকা পাইয়াছেন, তাহা জানিয়া সুখী হইলাম। চরকা সূতা কাটা প্রভৃতি বিষয়ে আপনি যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। তবে এখনও চেষ্টা ত্যাগ করিলে চলিবে না। আপনি পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তুলার চাষ করিতে পারিলে এক ভদ্রলোক আশী বিঘা জমি ছাড়িয়া দিতে পারেন। সেরূপ জমি পাইবার যদি সম্ভাবনা থাকে, তবে তুলার চাষের বেশী খরচ অগ্রিম লাগিবে না। দু'একজন মালীর বেতন ও তুলার বীজের দাম জোগাইতে পারিলে আমরা এক বৎসরের মধ্যে ফল পাইতে পারি। জমিটা পতিত হইলে চাষোপযোগী করিবার জন্য বেশী খরচ লাগিতে পারে। অবশ্য কৃষি-বিভাগের (Agricultural Department) সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে হইবে কোন্ জাতীয় তুলার বীজ লাগান উচিত। যে সব কুটীর-শিল্প আরম্ভ করিয়াছেন, (যেমন ঠোঙা তৈরী করা) সেগুলিতে

যদি লোকসান না হয়, তবে অল্প লাভ হইলেও চালাইবেন। পরে অপেক্ষাকৃত লাভজনক শিল্প চালাইতে পারিলে আমরা এগুলি বর্জ্জন করিব। এখন যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে, তাহাদিগকে অন্ততঃ যে কোনও প্রকারের কাজ করান দরকার। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া তাহারা যখন কাজ করিতে শিখিবে তখন লাভজনক শিল্পে তাহাদিগকে লাগাইয়া দিতে পারিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে! এখনকার কুটীর-শিল্পগুলি যদি financial success না হয় তবে কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও dignity of labour জাগাইয়া তুলিলেও সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে। কুটীর শিল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্ম্মণ মহাশয়ের অনেক রকম ধারণা আছে। আপনি যদি এই বিষয় সম্পর্কে তাঁহার সহিত একবার দেখা করিতে পারেন তাহা হইলে লাভ হইতে পারে।

বড়ি, আচার, চাটনি প্রভৃতি তৈরী করিতে পারিলে না চলিবার কোনও কারণ নাই। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষত বিধবারা এ কাজ ভাল করিতে পারিবে। কিন্তু শিখাইবার লোক পাইবেন কি? বাজারে চালাইতে গেলে এই জিনিষগুলি খুব ভাল হওয়া চাই। যদি ভাল জিনিষ প্রস্তুত করাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে এ বিষয়ে experiment করিতে পারেন। Raw materials আপনারা supply করিয়া তৈয়ারী মাল পাইতে পারেন—(বিক্রী করার ভার আপনাদের অবশ্য) অথবা তাহারা নিজেরাই Raw materials কিনিয়া এবং মাল প্রস্তুত করিয়া আপনাদের নিকট বিক্রয় করিয়া যাইতে পারে। কাজ আরম্ভ করবার পূর্ব্বে দোকানদারের সহিত কথা বলা প্রয়োজন—তাহারা আমাদের মাল চালাইতে পারিবে কি না। Raw materials ভাল হইলে অবশ্য জিনিষ ভাল হইতে পারে কিন্তু অপর দিকে চুরির সম্ভাবনা খুব বেশী। যাহারা

এই কাজ করিবে তাহারা গরীব সুতরাং আম, নেবু, তেল, লঙ্কা প্রভৃতি পাইলে যে তাহারা সংসারের কাজে লাগাইবে না তা কে বলিতে পারে? অপর দিকে তাহারা যদি Raw materials ক্রয় করিয়া মাল তৈয়ারী করিয়া supply করে তবে খারাপ উপাদানে (যেমন তেল) মাল তৈয়ারী হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ সব বিষয়ে আপনি স্বপক্ষের ও বিপক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। আর একটি কথা, এই সব বস্তুর বাজারের চাহিদা কি রকম তা জানা দরকার। আমার নিজের মনে হয় যে, খুব conscientious recipients না পাইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ার ভরসা কম। গরীব ভদ্র পরিবারদের দ্বারা এ কাজ চলিতে পারে। মাল তৈয়ারী হইয়া আসিলে সঙ্গে সঙ্গে তার দাম অথবা পারিশ্রমিক চুকাইয়া দিতে হইবে এবং বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত মালগুলি আমাদের ভাণ্ডারে রাখিতে হইবে।

সমিতির পক্ষে আর একটী কাজে হাত দেওয়া বিশেষ দরকার। কলিকাতায় দুইটী জেল আছে, প্রেসিডেন্সী ও আলিপুর সেন্ট্রাল। জেলের হাসপাতালে কোনও হিন্দু কয়েদী মারা গেলে আর তার যদি আত্মীয়-স্বজন কলিকাতায় না থাকে তবে তার উচিতমত সৎকার হয় না, পয়সা দিয়া ডোম বা মেথর শ্রেণীর লোক দিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। এদিকে মুসলমানদের Burial Association আছে এবং মুসলমান-কয়েদী মারা গেলে তারা খবর পাওয়া মাত্র সৎকারের ব্যবস্থা করে। এরূপ একটা organization হিন্দু কয়েদীদের জন্য করা প্রয়োজন। এ কাজের ভার কি সেবক-সমিতি লইতে পারে? যদি আপনাদের মত হয় তবে বসন্তবাবুকে দিয়া জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র দিতে পারেন যে, সেবকসমিতি এ-কাজের ভার লইতে প্রস্তুত আছে। আপনারা যদি এখন

ব্যবস্থা না-ও করিতে পারেন তবে আমি বাইরে গেলে নিজে এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। আমি নিজে লোকাভাব ঘটিলে অনেক সৎকার করিয়াছি, সুতরাং এরূপ কাজে আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতে স্বয়ং প্রস্তুত।

* * *

কুটীর-শিল্প যদি চালাইতে চান তবে একটা কাজ করা দরকার। একটী উপযুক্ত যুবককে কাশীমবাজার polytechnic অথবা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কিছু কাজ শিখিয়া লইতে হইবে। কাশীমবাজারের স্কুলে মাটীর পুতুল ও দেবদেবীর মূর্ত্তি খুব সুন্দর তৈয়ারী হয়। এইরূপ শিল্প যদি সমিতির সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে চালাইতে পারেন তবে তাহাদের প্রস্তুত মাল বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, (বিশেষত মেলা ও উৎসবের সময়) বিক্রয় হইতে পারে। আর একটী শিল্পের প্রচার এ দেশে আছে,—রঙীন কাগজ হইতে নানা প্রকার ফুল, তোড়া ও ফুল সমেত গাছ এবং Chinese lantern তৈয়ারী করা। জিনিষগুলি এত সুন্দর হয় যে, হঠাৎ দেখিলে চিনিবার উপায় থাকে না যে, এগুলি কাগজের তৈয়ারী! ভদ্রঘরের ছোট ছেলেমেয়েরাও এ কাজ খুব সুন্দর করিতে পারে।

ঢাকার বোতাম তৈয়ারী কুটীর-শিল্পহিসাবে চলিতেছে। অনেকের ধারণা যে ঢাকায় বোতাম বুঝি ফ্যাক্টরীতে তৈয়ারী হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না। পল্লীগ্রামের ঘরে ঘরে অবসর সময়ে, এমন কি রান্নার ফাঁকের মধ্যে মেয়েরা এই কাজ করিয়া থাকে—সেই জন্য এত সস্তায় জিনিষ পাওয়া যায়। বোতামের শিল্প কলিকাতায় প্রচার করা সম্ভব কি না সে বিষয়ে একটু চিন্তা করিবেন। হয় তো কিভাবে এই শিল্প কুটীরে কুটীরে চলিতেছে তাহা দেখিবার জন্য কাহাকেও ঢাকা জেলায় পাঠাইতে হইবে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রের বন্দোবস্ত ভবানীপুর অঞ্চলে করিতে পারিলে ভাল হয়। যেখানে গরীবদের বস্তী—বক্তৃতা হওয়া বেশী দরকার সেখানে। যদি সম্ভব হয় তবে সেবক-সমিতির জন্য একটা ম্যাজিক লণ্ঠনের আসবাব ও ছবি কিনিবার চেষ্টা করিবেন। ছায়াচিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিলে ঢের বেশী কাজ হইবে! ছবিগুলি না কিনিয়া কোন স্থানীয় চিত্রকরকে দিয়া আঁকাইয়া লইলে বোধ হয় ভাল হইবে। ইতি—

৪

[দক্ষিণ-কলিকাতা সেবক-সমিতির অন্যতম কর্ম্মী শ্রীমান্ হরিচরণ বাগচীকে লিখিত পত্রাংশ।]

মান্দালয় জেল
৩-৭-২৫

তোমার তিনখানা পত্র আমি যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিবার সুযোগ পাই নাই; তা ছাড়া শরীর ভাল নাই। কোনও প্রকার কাজ করিতে (এমন কি লেখা পড়া করিতে) মন লাগে না। পূর্ব্বে মাত্র দুইখানি পত্র সপ্তাহে লিখিতে পারিতাম—এখন একখানা লিখিতে পারি। ফলে দু'তিন মাসের চিঠি জমা হইয়া থাকে—উত্তর দিবার সুযোগ পাই না বলিয়া।

Social Service বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য—গরীবকে সাহায্য করিয়া তাহার দ্বারা কাজ করানো। শুধু দান করা Organised Charity-র উদ্দেশ্য হইতে পারে না। প্রতিদান না দিলে দান গ্রহণ করা যে আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর—এই ভাবটা গরীব সাহায্যপ্রার্থীদের

মনে জাগান উচিত। সুতরাং যদি কেহ সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত না হয়—তবে তাহার সাহায্য বন্ধ করা ভাল। তবে এ-ক্ষেত্রে দু'একটি কথা বিবেচনা করা উচিত—

১। যে সাহায্য গ্রহণ করে তার কাজ করিবার অবসর থাকা উচিত। অর্থাৎ যদি কোনও বিধবা সাহায্য গ্রহণ করে এবং গৃহস্থালী কাজ করিয়া তাহার যদি অন্য কাজ করিবার অবসর না থাকে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কাজ করাইবার জন্য জিদ করা উচিত নয়। আমাদের শুধু দেখা চাই যে, সাহায্য গ্রহণ করিয়া কেহ আলস্যে সময় কাটাইতেছে কি না। এই জন্য inspection বা স্থানীয় তদন্ত করিয়া সংবাদ লওয়া উচিত। সময় বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যাহারা কাজ করে না তাহাদের সাহায্য করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

২। যাহাদের শারীরিক সামর্থ্য নাই ও যাহাদের সংসারের অন্য কোন কার্য্যক্ষম লোক নাই তাহাদের কাজ করাইবার জন্য জিদ করা উচিত নয়।

৩। কাজ করাইতে হইলে variety of choice থাকা চাই, কারণ সব লোকের দ্বারা সব রকম কাজ হয় না। আগে সহজ কাজ লইয়া আরম্ভ করিবে, যেমন পুরাতন খবরের কাগজ দিয়া ঠোঙা প্রস্তুত করান—তারপর কঠিন কাজ শিখাইবে।

৪। যাহাদের কাজ করাইতে চাও তাহাদের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করা চাই। অনেক কাজ আছে যাহা মানুষে ভয় করে—না শেখা পর্য্যন্ত সে-ক্ষেত্রে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কাজ করিতে রাজী হইবে না, কিন্তু একবার কাজ শিখিলে তাহারা ক্রমশঃ কাজে মন দিবে।

আমরা ভিক্ষুকের জাতে পরিণত হইয়াছি, সুতরাং ভিক্ষুকের মনোভাব একদিনে পরিবর্ত্তিত হইবে না। যদি তোমরা আশা কর

যে, একদিনে ভিক্ষুকের প্রবৃত্তি বদলাইবে তাহা হইলে তোমরা হতাশ হইবে। Social service-এ অসীম ধৈর্য্য দরকার।

মোটের উপর তোমাদের কাজের প্রোগ্রাম এই—raw materials (যেমন খবর-কাগজ, তুলা অথবা ঝিনুক) তোমরা যোগাইবে। যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে তাহারা সাহায্যের বিনিময়ে raw materials হইতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া দিবে। সে জিনিষগুলি বিক্রয় করিবার ভার তোমাদের এবং সেই উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন দোকানের সঙ্গে তোমাদের বন্দোবস্ত করা উচিত, যাহাতে তোমাদের জিনিষ তাহারা ক্রয় করিয়া লয়। এই সব জিনিষ তাহারা বিক্রয় করিয়া খরচ খরচা বাদে যে লাভ থাকিবে তাহা হইতে সাহায্য দানে খরচ (অন্তত আংশিক ভাবে) উঠিয়া যাইবে। Public Charity-র উপর চিরকাল নির্ভর না করিয়া সমিতির একটা স্বতন্ত্র আয়ের ব্যবস্থা তোমাদের করা উচিত! অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ ও আয়াস-সাধ্য।

লাইব্রেরীর জন্য টাকা খরচ করিয়া বই না কিনিয়া author এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদের নিকট হইতে বই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিও।

অনিলবাবুকে বলিও যে, লাইব্রেরীর জন্য hap-hazardly কতকগুলো বই সংগ্রহ না করিয়া একটা method অনুসারে বই সংগ্রহ যেন করেন। অবশ্য বিনা খরচে যে সব বই পাইবে—সেগুলিও গ্রহণ করিবে। কিন্তু তথাপি একটা প্রণালী থাকা উচিত। সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা, ইংরাজী এবং ইউরোপীয় (Continental) সাহিত্যের নামকরা বই সংগ্রহ করিবে। তারপর ভারতের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাসের বই সংগ্রহ করিবে। তারপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং মহাপুরুষদের জীবনী সংগ্রহ করিও। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও রাজনীতি,

কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বই সংগ্রহের চেষ্টা করিও। যদি একসঙ্গে সব রকম বই সংগ্রহ করিতে পার তাহা হইলে ভাল হয়। মোট কথা, প্রত্যেক বিষয়ের অন্তত কতকগুলি বই রাখা চাই—যাহাতে যে কোনও রুচির লোক আসুক না কেন সে পড়িবার বই পাইবে। বাজে উপন্যাস রাখার প্রয়োজন নাই—তবে ভাল ভাল উপন্যাস রাখা উচিত। অল্পের মধ্যে একটা আদর্শ লাইব্রেরী করা চাই।

* * *

দূরদেশে যদি সূতা কিনিতে হয় তাহা হইলে তোমরা weaving depot. বেশী দিন রাখিতে পারিবে না। যাহাদের সাহায্য করিবে তাহাদের ঘরে এবং সমিতির সভ্যদের ঘরে সূতা উৎপাদনের চেষ্টা করা চাই। যদি অন্তত খানিকটা সূতা ভবানীপুরে কিংবা তার আশে পাশে তৈয়ারী না হয় তবে তোমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ। আর একটি কথা তোমাদের মনে রাখা উচিত। যদি স্থানীয় লোকেদের মধ্যে সূতা প্রস্তুত হয়—তবে জানিবে যে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সহানুভূতি আছে। স্থানীয় সহানুভূতির অভাবে কোনও প্রতিষ্ঠান বেশী দিন চলিতে পারে না।

স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এমন লোক পাইবে যাহারা সূতা কাটিবে অথচ সূতা বিক্রয় করিবে না। তাহাদের সূতায় যদি ধুতি বা শাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিতে পার—তবে তাহারা সূতা কাটিতে পারে। পূর্ব্বে অনেক লোক এইভাবে সমিতিতে ধুতি এবং শাড়ী প্রস্তুত করাইত। এখানকার অবস্থা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় যে, সমিতিতে সূতা লইয়া ধুতি শাড়ী প্রস্তুত করিবার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। সভ্যদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাহাতে সূতা প্রস্তুত হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখিবে। ইতি—

চরিত্র-গঠন ও মানসিক উন্নতি

১

[দক্ষিণ-কলিকাতা সেবক সমিতির অন্যতম কর্ম্মী শ্রীমান্ হরিচরণ বাগচীকে লিখিত পত্রাংশ]

মান্দালয় জেল

তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা সত্য—খাঁটি কর্ম্মীর অভাব বড় বেশী। তবে যেরূপ উপাদান জোগাড় হয় তাহা লইয়াই কাজ করিতে হইবে। জীবন না দিলে যেমন জীবন পাওয়া যায় না—ভালবাসা না দিলে যেমন প্রতিদান ভালবাসা পাওয়া যায় না—তেমনি নিজে মানুষ না হইতে মানুষ তৈয়ারী করাও যায় না।

রাজনীতির স্রোত ক্রমশঃ যেরূপ পঙ্কিল হইয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অন্ততঃ কিছু কালের জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে না। সত্য এবং ত্যাগ—এই দুইটি আদর্শ রাজনীতি-ক্ষেত্রে যতই লোপ পাইতে থাকে, রাজনীতির কার্য্যকারিতা ততই হ্রাস পাইতে থাকে। রাজনীতিক আন্দোলন নদীর স্রোতের মত কখনও স্বচ্ছ, কখনও পঙ্কিল; সব দেশে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। রাজনীতি অবস্থা এখন বাঙ্গলা দেশে যাহাই হউক না কেন, তোমরা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেবার কাজ করিয়া যাও।

* * *

তোমার মনের বর্ত্তমান অশান্তিপূর্ণ অবস্থার কারণ কি তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কি না জানি না—আমি কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি।

শুধু কাজের দ্বারা মানুষের আত্মবিকাশ সম্ভবপর নয়। বাহ্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়া ও ধ্যান-ধারণার প্রয়োজন। কাজের মধ্য দিয়া যেমন বাহিরের উচ্ছৃঙ্খলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং মানুষ সংযত হয়, লেখা-পড়া ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা যেরূপ inernal discipline; অর্থাৎ ভিতরের সংযম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিতরের সংযম না হইলে বাহিরের সংযম স্থায়ী হয় না। আর একটি কথা, নিয়মিত ব্যায়াম করিলে শরীরের যেরূপ উন্নতি হয়—তেমনি নিয়মিত সাধনা করিলেও সদ্বৃত্তির অনুশীলন ও রিপুর ধ্বংস হইয়া থাকে। সাধনার উদ্দেশ্য দুইটি :—(১) রিপুর ধ্বংস, প্রধানতঃ কাম, ভয় ও স্বার্থপরতা জয় করা, (২) ভালবাসা, ভক্তি, ত্যাগ, বুদ্ধি, প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করা।

কামজয়ের প্রধান উপায় সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে মাতৃরূপ দেখা ও মাতৃভাব আরোপ করা এবং স্ত্রী-মুর্ত্তিতে (যেমন দুর্গা কালী) ভগবানের চিন্তা করা। স্ত্রী-মুর্ত্তিতে ভগবানের বা গুরুর চিন্তা করিলে মানুষ ক্রমশঃ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে ভগলানকে দেখিতে শিখে। সে অবস্থায় পৌঁছিলে মানুষ নিস্কাম হইয়া যায়। এই জন্য মহাশক্তিকে রূপ দিতে গিয়া আমাদের পুর্ব্ব-পুরুষেরা স্ত্রী-মুর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক জীবনে সকল স্ত্রীলোককে "মা" বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ক্রমশঃ পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া যায়।

ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা মানুষ নিঃস্বার্থ হইয়া পড়ে। মানুষের মনে যখনই কোন ব্যক্তি বা আদর্শের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি বাড়ে তখন ঠিক সেই অনুপাতে স্বার্থপরতাও কমিয়া যায়। মানুষ চেষ্টার দ্বারা ভক্তি ও ভালবাসা বাড়াইতে পারে এবং তার ফলে স্বার্থপরতাও কমাইতে পারে। ভাল বাসিতে বাসিতে মনটা ক্রমশঃ সকল সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া

বিশ্বের মধ্যে লীন হইতে পারে। তাই ভালবাসা, ভক্তি বা শ্রদ্ধার যে-কোন বস্তু-বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করার দরকার। মানুষ যাহা চিন্তা করে ঠিক সেইরূপ সে হইয়া পড়ে। নিজেকে 'দুর্ব্বল পাপী' যে ভাবে সে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যে নিজেকে শক্তিমান ও পবিত্র বলিয়া নিত্য চিন্তা করে সে শক্তিমান ও পবিত্র হইয়া উঠে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

ভয় জয় করার উপায় শক্তিসাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্ত্তি শক্তির রূপবিশেষ। শক্তির যে কোন রূপ মনে মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্ব্বলতাও মলিনতা বলিস্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত হইয়াছে, সেই শক্তির **বোধন** করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য—মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ শক্তিরূপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থ পঞ্চেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষু আছে তাই আমরা ধূপ, গুগ্‌গুল প্রভৃতি সুগন্ধি জিনিষ দিয়া পূজা করি ইত্যাদি। বলির অর্থ রিপু বলি—কারণ ছাগই কামের রূপবিশেষ।

সাধনার একদিকে রিপু ধ্বংস করা, অপর দিকে সদ্‌বৃত্তির অনুশীলন করা। রিপুর ধ্বংস হইলেই সঙ্গে সঙ্গে দিব্যভাবের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আর দিব্যভাব হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেই সকল দুর্ব্বলতা পলায়ন করিবে।

প্রত্যহ (সম্ভব হইলে) দুইবেলা এইরূপ ধ্যান করিবে। কিছুদিন ধ্যান করার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পাইবে, শান্তিও হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবে।

আপাততঃ স্বামী বিবেকানন্দের এই বইগুলি পড়িতে পার। তাঁহার বই-এর মধ্যে 'পত্রাবলী' ও বক্তৃতাগুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই-এর মধ্যে এ সব বোধ হয় পাইবে। আলাদা বইও বোধ হয় পাওয়া যায়। 'পত্রাবলী' ও বক্তৃতাগুলি না পড়িলে অন্যান্য বই পড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। 'Philosophy of Religion', 'Jnan-Yoga' বা ঐ জাতীয় বইতে আগে হস্তক্ষেপ করিও না। তারপর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পড়িতে পার। রবিবাবুর অনেক কবিতার মধ্যে খুব inspiration পাওয়া যায়। ডি, এল, রায়ের অনেক বই আছে (যেমন 'মেবার পতন', 'দুর্গাদাস') যা পড়িলে বেশ শক্তি পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর ও রমেশ দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও খুব শিক্ষাপ্রদ ; নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'ও পড়িতে পার। 'শিখের বলিদান'ও (বোধ হয় শ্রীমতী কুমুদিনী বসু লিখিত) ভাল বই ; Victor Hugoর 'Les Miserables' পড়িও (বোধ হয় লাইব্রেরীতে আছে), খুব শিক্ষা পাইবে। তাড়াতাড়িতে এখন বেশী নাম দিতে পারিলাম না। আমি অবসরমত চিন্তা করিয়া একটা তালিকা করিয়া পাঠাইব। ইতি—

২

মান্দালয় জেল

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তুমি যদি প্রত্যহ কিছু ব্যায়াম-চর্চ্চা কর, তবে খুব উপকার পাবে। Müller-এর "My System" বই জোগাড় ক'রে যদি তদনুসারে ব্যায়াম কর তবে ভাল হয়। আমি নিজে মধ্যে মধ্যে Muller-এর ব্যায়াম ক'রে থাকি এবং উপকারও পেয়েছি। Muller-এর

ব্যায়ামের বিশেষত্ব এই :—(১) কোনও খরচ লাগে না এবং ব্যায়াম করবার জন্য জায়গা খুব কমই লাগে, (২) ব্যায়াম করলে অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় না এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই, (৩) শুধু অঙ্গবিশেষের পরিচালনা না হয়ে সমস্ত শরীরের, মাংস-পেশীর চালনা হয়, (৪) পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি হয়।

আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে—বিশেষতঃ ছাত্র-সমাজে—যদি মুলারের ব্যায়ামের বহুল প্রচলন হয় তা হইলে খুব উপকার হবে।

মানুষের দৈনন্দিন কাজ করেই সন্তুষ্ট বোধ করলে চলবে না। এই সব কাজ-কর্ম্মের যে উদ্দেশ্য বা আদর্শ অর্থাৎ আত্মবিকাশ-সাধন—সে কথা ভুললে চলবে না। কাজটাই চরম উদ্দেশ্য নয়; কাজের ভিতর দিয়ে চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করতে হবে। মানুষকে অবশ্য নিজের ব্যক্তিত্ব ও প্রবৃত্তি অনুসারে এক দিকে বৈশিষ্ট্য লাভ করতে হবে; কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের মূলে (specialization) একটা সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ চাই। যে ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় নাই সে অন্তরে কখনও সুখী হতে পারে না; তার মনের মধ্যে সর্ব্বদা একটা শূন্যতা বা অভাববোধ শেষ পর্য্যন্ত রয়ে যায়। এই সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য চাই :—(১) ব্যায়াম-চর্চ্চা (২) নিয়মিত পাঠ (৩) দৈনিক চিন্তা বা ধ্যান। কাজের চাপে মধ্যে মধ্যে এ সব দিকে দৃষ্টি থাকে না বা দৃষ্টি থাকলেও সময় হয়ে ওঠে না। কিন্তু কাজের চাপ কমলেই আবার এই সব দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দৈনিক কাজ-কর্ম্ম করে নিশ্চিন্ত হলে চলবে না; তার মধ্যে ব্যায়ামের সময় এবং লেখা-পড়া ও ধ্যান-ধারণারও সময় করে নিতে হবে। এই তিনটী অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য মানুষ যদি অন্ততঃপক্ষে প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা বা দু' ঘণ্টা

সময় দিতে পারে, তা হ'লে খুব উপকার হবে। মুলার বলেন যে, যদি কোনও ব্যক্তি নিয়মিতভাবে প্রতিদিন পনর মিনিট করে তাঁর উপদেশানুসারে ব্যায়াম করে তা হলেই যথেষ্ট। তারপর মানুষ যদি প্রতিদিন পনর মিনিট করে নির্জ্জনে চিন্তা বা ধ্যান করে—তবে মোট সময় লাগবে আধ ঘন্টা। এর সঙ্গে যদি আর এক ঘণ্টা লেখা-পড়ার জন্য রাখা যায় (খবর-কাগজ পড়া নয়—খবর-কাগজ পড়বার সময় আলাদা ধরতে হবে)—তবে দিনের মধ্যে মোট সময় লাগবে দেড় ঘন্টা। অন্ততঃপক্ষে এই দেড় ঘণ্টা সময় করে নিতে হবে—তার পর "অধিকন্তু ন দোষায়"—যত বেশী সময় দিতে পার—তত ভাল। প্রত্যেককে নিজের সুবিধা অনুসারে এই সময় করে নিতে হবে। ধ্যান ধারণার বিষয়ে আমি বোধ হয় পূর্ব্ব পত্রে কিছু লিখেছি—তাই সে সম্বন্ধে এখানে আর কিছু লিখলাম না। বইগুলির নাম আমি এই পত্রে দিচ্ছি। প্রথমে যে বইগুলি সমিতির লাইব্রেরীতে পাবে তার নাম দিচ্ছি—তারপর অন্যান্য বইয়ের নাম দিচ্ছি :—

(ক) ধর্ম্মসম্বন্ধীয়

(১) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' ; (২) 'ব্রহ্মচর্য্য'—সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; ঐ—রমেশ চক্রবর্ত্তী ; ঐ—ফকিরচন্দ্র দে ; (৩) 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ'—শরৎ চক্রবর্ত্তী ; (৪) 'পত্রাবলী'—বিবেকানন্দ ; (৫) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—বিবেকানন্দ ; (৬) 'বক্তৃতাবলী'—বিবেকানন্দ ; (৭) ভাববার কথা'—ঐ ; (৮) 'ভারতের সাধনা'—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ; (৯) 'চিকাগো (chicago) বক্তৃতা'—স্বামী বিবেকানন্দ।

(খ) সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস প্রভৃতি :—

(১) 'দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সংস্করণ); (২) 'বাঙ্গলার রূপ'

—গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী; (৩) 'বঙ্কিম গ্রন্থাবলী'; (৪) নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'রৈবতক' ও 'পলাশীর যুদ্ধ'; (৫) 'যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সংস্করণ); (৬) রবি ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী', 'চয়নিকা', 'গীতাঞ্জলি', 'ঘরে বাইরে', 'গোরা'; (৭) ভূদেববাবুর 'সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'পারিবারিক প্রবন্ধ; (৮) ডি, এল্, রায়ের 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', 'রাণা প্রতাপ', (৯) 'ছত্রপতি শিবাজী'—সত্যচরণ শাস্ত্রী; (১০) 'শিখের বলিদান'—কুমুদিনী বসু; (১১) রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল'; (১২) সত্যেন দত্তের 'কুহু ও কেকা' (কবিতা গ্রন্থ); (১৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনচরিত' (১৪) 'রাজস্থান' (বসুমতী সংস্করণ); (১৫) 'নব্য জাপান'—মন্মথ ঘোষ; (১৬) 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস'—রজনীকান্ত গুপ্ত; (১৭) উপেনবাবুর 'নির্ব্বাসিতের আত্মকথা' ও অন্যান্য পুস্তক; (১৮) 'কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস'—উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুপাঠ্য ৵০ আনা সংস্করণের ভারতের অনেক মহাপুরুষের ছোট ছোট জীবনী পাবে।

এই বইর তালিকা যথেষ্ট। অন্ততঃপক্ষে এক বৎসরের খোরাক এর মধ্যে পাবে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলি।

প্রাথমিক শিক্ষার সহিত উচ্চ শিক্ষার একটা বড় প্রভেদ এই যে প্রাথমিক শিক্ষার নূতন facts শিখাবার চেষ্টাই বেশী প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষার নূতন facts যেরূপ শিখাতে হয় তার সঙ্গে সঙ্গে reasoning faculty-র অনুশীলনও সেইরূপ করতে হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় ইন্দ্রিয়-শক্তির উপর বেশী নির্ভর করতে হয়, কারণ তখন চিন্তা করবার বা মনে রাখবার শক্তি ভাল রকম জাগে। সে জন্য কোনও বিষয় শেখাতে গেলে যেমন গরু, ঘোড়া, ফল, ফুল, সেই জিনিষগুলি চোখের সামনে না ধরলে

শেখান মুস্কিল। উচ্চ শিক্ষায় এমন বিষয় বা বস্তু শেখান হয় যা ছাত্র কখনও দেখে নাই এবং ছাত্র সেই বস্তু না দেখেও নিজের চিন্তা-শক্তির বলে তা বুঝতে পারে। আর একটা কথা—শেখাবার সময়ে যত বেশী ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নেওয়া যায়—তত সহজে শেখান সম্ভব। বাঁশী বা কোনও রকম বাজনা সম্বন্ধে যদি কিছু বোঝাতে চাও—তবে ছাত্র যদি জিনিষটা চোখে দেখে, হাতে স্পর্শ করে এবং বাজিয়ে তার আওয়াজ কানে শোনে, তবে সেই বিষয়ে তার জ্ঞান খুব শীঘ্র লাভ হবে। কারণ দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্তি, এবং শ্রবণশক্তি সে এক সঙ্গে কাজে লাগিয়েছে। কোলের শিশু যে-কোনও জিনিষ দেখবামাত্র স্পর্শ করতে চায় এবং মুখে দিতে চায়—তার কারণ এই যে, শিশু সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করতে চায়। অতএব প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে আমরা যদি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান জন্মাতে পারি তবে ফল লাভ খুব শীঘ্র হবে। পাটীগণিত শেখাবার সময়ে শুধু মুখস্থ না করিয়ে যদি কড়ি, marble অথবা ইট পাথরের টুকরা দিয়ে আমরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির উদাহরণ দেখাতে পারি তবে সেই সব জিনিষ শিশুরা খুব শীঘ্র শিখতে পারবে।

আর একটা বড় কথা—শুধু মানসিক শিক্ষা না দিয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা চাই। পুতুল তৈয়ারী করা, মানচিত্র মাটী দিয়ে তৈরী করা, ছবি আঁকা, রঙের ব্যবহার, সহজ গান শিক্ষা—এ সবের ব্যবস্থা করা চাই। ইহা দ্বারা শিক্ষাটা যে শুধু সর্ব্বাঙ্গীন হবে তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়ারও বিশেষ উন্নতি হবে। পাঁচ রকম জিনিষ শেখাতে পারলে ছেলেদের মনটা সজাগ হয়, বুদ্ধি বাড়ে, লেখা-পড়ায় মন লাগে—এবং লেখা-পড়ার নাম শুনলে ভীতির উদ্রেক হয় না। পাঁচ রকম জিনিষ

না শিখে ছাত্র যদি কেবলি মুখস্থ ক'রে লেখা-পড়া শিখিতে আরম্ভ করে, তবে সে লেখা-পড়ার মধ্যে রস পায় না, লেখা-পড়াকে ভয় করতে শেখে এবং তার বুদ্ধি বিকশিত হয় না। শিশুর চোখ, কান, হাত, জিহ্বা, নাক যদি উপভোগের এবং জানবার বস্তু পায়, তবে এই সব ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে, এর ফলে মনেও বুদ্ধি জাগরিত হয় এবং সকল রকম জ্ঞান সংগ্রহের ফলে লেখা-পড়ার সে রস পায়। Manual training না হ'লে শিক্ষার গোড়ায় গলদ রয়ে যায়। নিজের হাতে কোনও জিনিষ প্রস্তুত করলে যেরূপ আনন্দ পাওয়া যায়, সেরূপ আনন্দ পৃথিবীতে খুব অল্পই পাওয়া যায়। সৃষ্টির মধ্যে গভীর আনন্দ নিহিত রয়েছে। সেই joy of creation শিশুরা অল্প বয়সেই উপভোগ করে যখন তারা নিজের হাতে কোনও বস্তু তৈয়ারী করে। বাগানে বীজ পুঁতে গাছের সৃষ্টির দ্বারাই হোক, অথবা নিজের হাতে পুতুল তৈয়ারী করেই হোক, যে-কোনও বস্তু নূতন করে সৃষ্টি করতে পারলে শিশুরা গভীর আনন্দ উপভোগ করে। যে সব উপায়ে ছাত্রেরা এই আনন্দ অল্প বয়সেই উপভোগ করতে পারবে তার ব্যবস্থা করা চাই। এর দ্বারা তাদের originality বা ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুবিধা হবে এবং লেখা-পড়াকে ভয় না করে তারা উপভোগ করতে শিখবে। বিলাতে অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রেরা বাগানের কাজ শেখে, ব্যায়াম-চর্চ্চা করে, drill করে, পড়ার মাঝখানে খেলাধূলা করে, গান বাজনা শেখে, route march ক'রে পথে পথে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়, clay-modelling (মাটি দিয়ে পুতুল প্রভৃতি তৈয়ারী করা) শেখে, গল্পচ্ছলে নানা বিষয় এবং নানা দেশের কথা শেখে। গল্পচ্ছলে শেখান সব চেয়ে বেশী দরকার। ছাত্রেরা যেন না বুঝতে পারে যে তারা লেখা-পড়া শিখছে, তারা যেন অনুভব করে যে, তারা গল্প শুনছে

অথবা খেলা করছে। প্রথমাবস্থায় Text Book-এর আদৌ প্রয়োজন নাই। গাছ-পালা, ফুল প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন শেখাবে তখন যেন সামনে গাছ-পালা এবং ফুল থাকে। আকাশ, তারা প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন শেখাবে তখন মুক্ত আকাশের তলে নিয়ে গিয়ে তাদের শিক্ষা দিবে। যে জিনিষই শেখাবে তা যেন সকল ইন্দ্রিয়ের সামনে উপস্থিত থাকে। যখন ভূগোল শিখাবে তখন মানচিত্র, globe প্রভৃতি যেন থাকে, ইতিহাস যখন শেখাবে তখন সুবিধামত museum প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাবে। খুব গরীব চালেও গান শিক্ষা, painting, drawing প্রভৃতি শিক্ষা, gardening শিক্ষা প্রভৃতি চাই। তা না হলে প্রাথমিক শিক্ষা একেবারে ব্যর্থ। বস্তুজ্ঞানই বেশী দরকার। পাঠ মুখস্থের তত বেশী প্রয়োজন নাই।

আমি প্রাথমিক শিক্ষার principles বা নীতি বিষয়ে কিছু বললুম। Text Book-এর কথা হচ্ছে ক'রেই বলি নাই। Text Book-এর প্রয়োজন কম এবং পাঠ্যপুস্তক যেগুলি রাখতে হবে সেগুলির importance কম, ভাল শিক্ষক না হলে প্রাথমিক শিক্ষা সার্থক হতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষার fundamental principles সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষককে বুঝতে হবে। তারপর তিনি নূতন প্রণালীতে শিক্ষা-প্রবর্ত্তন করতে পারবেন। শিক্ষকের অন্তরের ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারা শিক্ষককে ছাত্রের দিক থেকে সব জিনিষ দেখতে হবে। ছাত্রের অবস্থা যদি শিক্ষক নিজেকে কল্পনা না করতে পাবে, তবে সে কি করে ছাত্রের difficulty এবং ভুলভ্রান্তি বুঝতে পারবে? সুতরাং personality of teacher হচ্ছে সব চেয়ে বড়। শিক্ষার প্রধান উপাদান তিনটী:—(১) শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব (২) শিক্ষার প্রণালী (৩) শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য-পুস্তক। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব না থাকলে কোনও শিক্ষা সম্ভবপর নয়। চরিত্রবান

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া গেলে তারপর আমাদের শিক্ষার প্রণালী নির্দ্ধারিত হয়, তবে যে-কোনও বিষয়ক পুস্তক সহজে শেখান যেতে পারে।

* * * *

আশা করি তোমাদের কুশল। ইতি—

৩

মান্দালয় জেল

ইং ৬।২।২৬

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া কিছু মনে করিও না। আশা করি তুমি সকল প্রকার মানসিক অশান্তি দূর করিয়া প্রফুল্লভাবে সকল কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে। Milton বলিয়াছেন—"The mind is its own place and can make a hell of heaven and a heaven of hell." অবশ্য এ কথা কার্য্যে পরিণত করা সব সময়ে সম্ভব হয় না; কিন্তু আদর্শ সব সময় চোখের সামনে না রাখিলে জীবনে অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব। জীবনের কোনও অবস্থাই অশান্তিহীন নহে—এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

আমার মুক্তির কথা আমি আর ভাবি না—তোমরাও ভাবিও না। ভগবানের কৃপায় আমি এখানে মানসিক শান্তি পাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে এখানে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতে পারি—এরূপ শক্তি পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। আমার শুভ ইচ্ছার কোনও প্রভাব নাই; কিন্তু বিশ্বজননীর শুভ ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ তোমাকে বর্ম্মের মত সর্ব্বদা আচ্ছাদন করিয়া রাখুক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। আমি কি লিখিব—বিশ্বজননীতে বিশ্বাস ও ভরসা রাখিও—তুমি তাঁর কৃপায় সকল বিপদ ও মোহ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। মনের মধ্যে সুখ ও শান্তি না থাকিলে কোনও অবস্থায় (বাহিরের অভাব দূর হইলেও) মানুষ সুখী হইতে পারে না। সুতরাং সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজননীর চরণে হৃদয় নিবেদন করা চাই। ইতি—

[তদানান্তর 'আত্মশক্তি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপাললাল সান্যালকে লিখিত পত্রাংশ]

ইনসিন জেল

৫ই এপ্রিল, ১৯২৭

পরম প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ৫ই চৈত্রের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন—কি উত্তর দিব জানি না। অনেক কথাই ত লিখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু লেখা যায় কি?

শরীরের সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই—"যথা পূর্ব্বং তথা পরং"। পরিণামে কি দাঁড়াইবে জানি না—এখন আর শরীরের কথা ভাবি না। গত কয়েক মাসের মধ্যে আমার মনের গতি কোনও কোনও দিকে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, জীবনে ষোল আনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হইলে মেরুদণ্ড ঠিক রাখা মুস্কিল হইয়া পড়ে। জীবন-প্রভাতে এই প্রার্থনা বুকে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম—"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।" ভবিষ্যতের কথা জানি না, তবে এখন পর্য্যন্ত ভগবান সে প্রার্থনা সফল করিয়া আসিতেছেন। তাই আমি বড় সুখী—সময়ে সময়ে মনে হয়, আমার মত সুখী জগতে আর কয়জন আছে? এখন এই বৃত্তাকার উন্নত প্রাচীরের বাহিরে যাইবার আশা যে পরিমাণে সুদূরপরাহত হইতেছে, সেই পরিমাণে আমার চিত্ত শান্ত ও উদ্বেগশূন্য হইয়া আসিতেছে। অন্তরের

মধ্যে বাস করা ও অন্তরের আত্মবিকাশের স্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দেওয়ার মধ্যে পরম শান্তি আছে এবং বেশী দিন রুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে হইলে অন্তরের শান্তিই একমাত্র সম্বল—তাই সুদীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্ব্ব শান্তি পাইতেছি। Emerson বলিয়াছেন, "We must live wholly from within." এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর আমার বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে।

আমার মত যাঁহাদের অবস্থা তাঁহারা যদি বাহিরের ঘটনার দ্বারা জীবনের সার্থকতা বা বিফলতা নির্দ্ধারণ করেন তবে—"মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ"। যে মাপকাঠির দ্বারা আমাদের (অর্থাৎ বন্দীদের) বিচার করিতে হইবে—তাহা অন্তরের, বাহিরের নয়। কারণ বাহিরের মাপ-কাঠিতে হয় তো আমাদের জীবনের মূল্য শূন্যবৎ। এইখানেই যদি যবনিকাপাত হয় তবে বাস্তব সংসারের উপর আমাদের জীবনের স্থায়ী ছাপ না থাকিতেও পারে। কিন্তু জীবনে যদি আর কোনও কাজ না করিতে পারি—আদর্শকে বাস্তবের ভিতর দিয়া যদি ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ না পাই—তাহা হইলেও আমার জীবন ব্যর্থ হইবে না। মহান্ আদর্শ যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি—কায়মন যদি সেই মহান্ আদর্শের সুরে বাঁধিয়া থাকি—আদর্শের সহিত নিজের অস্তিত্ব যদি মিশিয়া থাকে— তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট—আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও, আমার (এবং বোধ হয় ভাগ্যবিধাতার) কাছে ব্যর্থ নয়। জগতে সব কিছুই ক্ষণ-ভঙ্গুর—শুধু একটা বস্তু ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না—সে বস্তু,—ভাব বা আদর্শ। আমাদের আদর্শ, সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিন্তাধারা—অবিনশ্বর। ভাবকে প্রাচীরের দ্বারা কি কেহ ঘিরিয়া রাখিতে পারে?

ষোল আনা দিতে হইলে অপর দিকে আদর্শকে ষোল আনা পাওয়া চাই। অথবা আদর্শকে ষোল আনা পাইতে হইলে নিজের ষোল আনা দেওয়া চাই। ত্যাগ ও উপলব্ধি—renunciation and realisation একই বস্তুর এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এখন এই ষোল আনা পাওয়া ও ষোল আনা দেওয়ার জন্য আমার মনপ্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

যিনি এত দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়া আমাকে শক্তির উচ্চ শিখরে লইয়া আসিয়াছেন—তিনি কি দয়া করিবেন না? উপনিষদে বলে, "যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ"—এখন দেখা যাক্।

Systematic study অনেক দিন হইল ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছি। জাতীয়তার ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটী মূল-সমস্যার সমাধানের জন্য লেখা-পড়া ও গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলাম। আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে। কবে আবার আরম্ভ করিতে পারিব জানি না। বাহিরে গেলে এই কাজ চাপা পড়িবে—তাই এখানে থাকিতে থাকতেই কাজ শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল। আমার কারাবাসের কাজ বোধ হয় এখনও সমাপ্ত হয় নাই —তাই বোধ হয় যাইবারও বিলম্ব আছে।

* * *

ভগবান আপনাদের সকলকে কুশলে রাখুন এবং আপনাদের ক্রিয়া-কলাপের উপর তাঁহার শুভ আশীষ নিরন্তর বর্ষিত হউক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ইতি—

জেল ও কয়েদী

[নিম্নের পত্র দুইখানি শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে লিখিত]

১

মান্দালয় জেল

২।৫।২৫

প্রিয় দিলীপ,

তোমার ২৪।৩।২৫ তারিখের চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আশঙ্কা করেছিলে যে, মাঝে মাঝে যেমন ঘটে এবারও বুঝি তেমনি চিঠিখানাকে "double distillation"-এর ভিতর দিয়ে আস্‌তে হবে; কিন্তু এবার তা হয়নি সেজন্য খুবই খুসী হয়েছি।

তোমার চিঠি হৃদয়তন্ত্রীকে এমনই কোমল ভাবে স্পর্শ ক'রে চিন্তা ও অনুভূতিকে অনুপ্রাণিত করেছে যে, আমার পক্ষে এর উত্তর দেওয়া সুকঠিন। এ চিঠিখানিকে যে আবার "censor"-এর হাত অতিক্রম ক'রে যেতে হবে সেও আর এক অসুবিধা; কেন না, এটা কেউ চায় না যে, তার অন্তরের গভীরতম প্রবাহগুলি দিনের উন্মুক্ত আলোতে প্রকাশ হ'য়ে পড়ুক। তাই এই পাথরের প্রাচীর লৌহ-দ্বারের অন্তরালে বসে আজ যা ভাব্‌ছি ও যা অনুভব করছি, তার অনেকখানিই কোন এক ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত অকথিতই রাখ্‌তে হবে।

আমাদের মধ্যে এতগুলি যে অকারণে বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে জেলে আছি, সেই চিন্তা তোমার প্রবৃত্তি ও মার্জ্জিত রুচিকে আঘাত করবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটনাগুলি যখন মেনে চলতেই

হচ্ছে তখন সমস্ত ব্যাপারটাকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও দেখা যেতে পারে। এ-কথা আমি বলতে পারি না যে, জেলে থাকাটাই আমি পছন্দ করি—কেন না, সেটা নিছক ভণ্ডামী হ'য়ে পড়ে। আমি বরং আরও বলি যে, কোন ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটা মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী এবং আমার বিশ্বাস এ-কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাস-কালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরো হীন হয়ে পড়ে। এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে, এতদিন জেলে বাস করার পর কারা-শাসনের একটা আমুল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কার আমার একটা কর্ত্তব্য হবে। ভারতীয় কারা-শাসন-প্রণালী একটা খারাপ (অর্থাৎ ব্রিটিশ-প্রণালীর) আদর্শের অনুসরণ মাত্র, ঠিক যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা খারাপ, অর্থাৎ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের অনুকরণ। কারা-সংস্কারবিষয়ে আমাদের বরং আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্স্-এর মত উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত।

এই ব্যবস্থার যেটি সব চেয়ে বড় প্রয়োজন, সে হচ্ছে একটা নূতন প্রাণ বা যদি বল, একটা নূতন মনোভাব এবং অপরাধীদের প্রতি একটা সহানুভূতি। অপরাধীদের প্রবৃত্তিগুলিকে মানসিক ব্যাধি বলেই ধরতে হবে এবং সেই ভাবেই তাদের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিষেধমুলক দণ্ডবিধি—যেটা কারা-শাসন-বিধির ভিতরের কথা বলে ধরা যেতে পারে—তাকে এখন সংস্কারমুলক নূতন দণ্ডবিধির জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হবে।

আমার মনে হয় না, আমি যদি স্বয়ং কারাবাস না করতাম তাহ'লে

একজন কারাবাসী বা অপরাধীকে ঠিক সহানুভূতির চোখে দেখতে পারতাম। এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, আমাদের দেশের আর্টিষ্ট বা সাহিত্যিকগণের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকৃত তাহ'লে আমাদের শিল্প এবং সাহিত্য অনেকাংশে সমৃদ্ধ হতো। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা যে তার জেলের অভিজ্ঞতার নিকট কতখানি ঋণী সে কথা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না।

আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি, তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অন্তরে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে। যদি আমাদের জীবনের সকল মুহূর্ত্ত ব্যাপে এই ধারণাটা প্রসারিত হয়ে থাকত তাহলে দুঃখে কষ্টে আর কোন যন্ত্রণা থাকত না এবং তাইতেই ত আত্মা ও দেহের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলেছে।

সাধারণতঃ একটা দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেইখানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই ক'রে নিয়েছি এবং দর্শনবিষয়ে যতটুকু পড়া-শুনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে, দেখবার মত যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায়, বন্দী হ'লেও তার কষ্ট নেই, অবশ্য যদি তার স্বাস্থ্য অটুট থাকে ; কিন্তু আমাদের কষ্ট ত শুধু আধ্যাত্মিক নয়—সে যে শরীরেও কষ্ট এবং প্রস্তুত থাকলেও, দেহ যে সময় সময় দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।

৺লোকমান্য তিলক কারাবাস-কালে গীতার সমালোচনা লেখেন। এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালয় জেলে ছ'বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।

এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে, জেলের মধ্যে যে নির্জ্জনতায় মানুষকে বাধ্য হয়ে দিন কাটাতে হয় সেই নির্জ্জনতাই তাকে জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে বুঝবার সুযোগ দেয়। আমার নিজের সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারি যে, আমাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের অনেক জটিল প্রশ্নই বছরখানেক আগের চেয়ে এখন যেন অনেকটা সমাধানের দিকে পৌঁছচ্ছে। যে সমস্ত মতামত এক সময়ে নিতান্ত ক্ষীণভাবে চিন্তা বা প্রকাশ করা যেত, আজ যেন সেগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অন্য কারণে না হ'লেও শুধু এই জন্যই আমার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, অনেকখানি লাভবান হতে পারব।

আমার কারাবাস ব্যাপারটিকে তুমি একটা 'Martyrdom' ব'লে অভিহিত করেছ। অবশ্য ও-কথাটা তোমার গভীর অনুভূতির ও প্রাণের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু আমার সামান্য কিছু 'humour' ও 'proportion'-এর জ্ঞান আছে, (অন্ততঃ আশা করি যে আছে) তাই নিজকে 'Martyr' বলে মনে করবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। স্পর্দ্ধা বা আত্মম্ভরিতা জিনিষটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে চাই, অবশ্য সে বিষয়ে কতখানি সফল হয়েছি, শুধু আমার বন্ধুরাই বলতে পারেন। তাই 'Martyrdom' জিনিষটা আমার কাছে বড়জোর একটা আদর্শই হ'তে পারে।

আমার বিশ্বাস, বেশী দিনের মেয়াদীর পক্ষে সব চেয়ে বড় বিপদ এই যে, আপনার অজ্ঞাতসারে তাকে অকালবার্দ্ধক্য এসে চেপে ধরে, সুতরাং এ-দিকে তার বিশেষ সতর্ক থাকাই উচিত। তুমি ধারণাই করতে পারবে না, কেমন ক'রে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকালবৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, অবশ্য অনেকগুলি কারণই এর জন্যে দায়ী—যথা, খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফূর্ত্তির অভাব, সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন

থাকা, একটা অধীনতার শৃঙ্খল-ভার, বন্ধুজনের অভাব এবং সঙ্গীতের অভাব, যাহা সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হ'লেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষ ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যেগুলি বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এই সব বাইরের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকালবার্দ্ধক্যের জন্য কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্যে সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আমাদের নেই। পিক্‌নিক্, বিশ্রম্ভালাপ, সঙ্গীত-চর্চ্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খোলা জায়গায় খেলা-ধুলা করা, মনোমত কাব্য সাহিত্যের চর্চ্চা—এ সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতখানি সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে যে, আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না এবং যখন আমাদিগকে জোর ক'রে বন্দী ক'রে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়। যতদিন জেলের মধ্যে বেশ স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন কয়েদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুলি আজকালকার মত নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতির কেন্দ্র হয়েই থাকবে।

এ-কথা আমার লিখতে ভোলা উচিত নয় যে, আপনার নিজের লোকের, বন্ধুবান্ধবের এবং সর্ব্ব-সাধারণের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা মানুষকে জেলের মধ্যেও অনেকখানি সুখ দিতে পারে। এই দিকের প্রভাবটা নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ও সূক্ষ্মভাবে কাজ করলেও নিজের মনটাকে আমি বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে পাই যে, এই ভাব কিছুতেই কম বাস্তব নয়। সাধারণ ও রাজনৈতিক অপরাধীদের অদৃষ্টের পার্থক্যের এটা একটা নিশ্চিত কারণ। যে রাজনৈতিক অপরাধী, সে জানে মুক্তি পেলে সমাজ তাকে বরণ ক'রে নেবে, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের তেমন কোন সান্ত্বনা

নেই। সে বোধ হয় তার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও কোন সহানুভূতিই আশা করতে পারে না এবং সেই জন্যই সাধারণের কাছে মুখ দেখাতে সে লজ্জা পায়। আমাদের yard-এ যে সমস্ত কয়েদীর কাজ করতে হয় তাদের কেউ কেউ আমাকে বলে যে, তাদের নিজের লোকেরা জানেই না যে, সে জেলে বন্দী। লজ্জায় তারা বাড়ীতে কোন সংবাদও দেয় নি। এ ব্যাপারটা আমার কাছে নিতান্ত অসন্তোষজনক বলে মনে হয়। সভ্য সমাজ অপরাধীদের প্রতি আরও সহানুভূতি কেন দেখাবে না?

আমার জেলের অভিজ্ঞতা বা তার থেকে যে সমস্ত চিন্তা মনে আসে সে সম্বন্ধে পাতার পর পাতা লিখে যেতে পারি কিন্তু একটা চিঠির ত শেষ আছে। আমার বেশী উদ্যম ও শক্তি থাকলে একখানা বই লিখে ফেলবার চেষ্টা করতাম কিন্তু সে চেষ্টার উপযুক্ত সামর্থ্যও আমার নেই।

আমাদের জেলের কষ্ট দৈহিক অপেক্ষা মানসিক বলে মনে করার আমি পক্ষপাতী। যেখানে অত্যাচার ও অপমানের আঘাত যথাসম্ভব কমে আসে, সেখানে বন্দী-জীবনটা ততটা যন্ত্রণাদায়ক হয় না। এই সমস্ত সূক্ষ্মধরণের আঘাত উপর থেকেই আসে, জেলের কর্ত্তাদের এ বিষয়ে কিছু হাত থাকে না। আমার অন্ততঃ এই রকমই অভিজ্ঞতা। এই যে সব আঘাত বা উৎপীড়ন—এগুলো আঘাতকারীর প্রতি মানুষের মনকে আরও বিরূপ ক'রে দেয় এবং সেই দিক দিয়ে দেখলে মনে হয়, এগুলোর উদ্দেশ্য ব্যর্থ। কিন্তু পাছে আমরা আমাদের পার্থিব অস্তিত্ব ভুলে যাই এবং নিজেদের অন্তরের মধ্যে একটা আনন্দধাম গড়ে তুলি, তাই এই সব আঘাত আমাদের উপর বর্ষণ ক'রে আমাদের স্বপ্নাবিষ্ট আত্মাকে জাগিয়ে বলে দেয় যে, মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা কি কঠোর ও নিরানন্দময়।

তুমি বলেছ যে, মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন, কেমন করে সমস্ত

পৃথিবীর মাটীকে একেবারে তলা পর্য্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে,—এই দৃশ্য তোমাকে প্রতিদিন গম্ভীর ও বিষণ্ণ করে তুলেছে। কিন্তু এই অশ্রু সব টুকুই দুঃখের অশ্রু নয়। তার মধ্যে করুণা ও প্রেমবিন্দুও আছে। সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দস্রোতে পৌঁছাবার সম্ভাবনা থাকলে কি তুমি দুঃখ-কষ্টের ছোটখাট অগভীর ঢেউগুলি পার হয়ে যেতে অরাজী হতে? আমি নিজে ত দুঃখবাদ বা নিরুৎসাহের কোন কারণ দেখি না; বরং আমার মনে হয়, দুঃখ-যন্ত্রণা উন্নততর কর্ম্ম ও উচ্চতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে কর, বিনা দুঃখ-কষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোন মূল্য আছে?

তুমি কিছুদিন পূর্ব্বে যে সব বই পাঠিয়েছিলে তার সবগুলিই পেয়েছি। সেগুলি এখন ফিরে পাঠাতে পারব না, কারণ তাদের অনেক পাঠক জুটেছে। তোমার পছন্দ যে রকম সুন্দর তাতে এ-কথা বলা অনাবশ্যক যে, আরও বই সাদরে গৃহীত হবে। ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

২

মান্দালয় জেল

২৫।৬।২৫

প্রিয় দিলীপ,

আমার শেষ চিঠির পরে তোমার কাছ থেকে সর্ব্বসমেত তিনখানি চিঠি পেয়েছি। চিঠিগুলির তারিখ—৬ই মে, ১৫ই মে ও ১৫ই জুন।

তোমার প্রেরিত বইয়ের শেষ পার্শ্বেলটা পেয়েছি। টুর্গেনিভের Smoke বইটা পাইনি। আফিসে পার্শ্বেলটী খোলা হয়েছিল, সুতরাং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এ বিষয়ে খোঁজ নিতে বলেছি। দরকার হলে কল্‌কাতায় C. I. D. আফিসে তিনি খোঁজ করবেন। তুমিও D. I. G. C. I. D-কে লিখে এ বিষয়ে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পার।

Bertrand Russel-এর "Prospects of Industrial Civilisation". খানি বহরমপুর জেলে কয়েকজন কয়েদীর কাছে আছে। আমাদের যখন স্থানান্তরিত করা হয়, তখন অনেকেই সেই বইখানি কাছে রাখবার আগ্রহ প্রকাশ করেন, আর বাস্তবিক একজন তখনও বইটা পড়ছিল। বইখানা তোমার দরকার হবে সে কথা না জেনে সেখানে রেখে এসেছিলাম। রাসেলের বইগুলির আদর এত বেশী যে, একখানা পেলে কেউ শীঘ্র ছাড়তে চায় না। বহরমপুর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আজ লিখলাম তিনি যেন তোমার কাছে বইখানা পাঠিয়ে দেন। তুমি তাঁকে লিখতে পার, তাতে কাজটা তাগাদা হবে। তোমার এত দরকারের সময় বইটা আট্‌কে রাখবার জন্যে দায়ী বলে বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ এত অসুবিধার কথা আগে আমি ভেবে উঠতে পারি নি। "Free Thought and Official propaganda" ত আমার কাছে নেই—এ বইটা তুমি আমাকে পাঠাও নি?

বই বেছে দেওয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা সকলে আশা করি, তুমি যে কাজ আরম্ভ করেছ ভগবানের ইচ্ছায় তা ভালভাবেই চলবে। তোমার লেখাগুলি যে আমি সসম্মানে পাঠ করব সে কথা বিশেষ করে বলবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। বই প্রকাশ করবার সময় প্রচ্ছদপটের দিকে যেন নজর রেখো। এইমাত্র একখানা হালের

"বঙ্গবাণী"তে রবীন্দ্রনাথের উপর তোমার লেখা একটা প্রবন্ধ দেখলাম। আমি এখনও সেটা পড়ি নি কিন্তু বিষয়টা চিত্তাকর্ষক বলেই বোধ হল।

তুমি জান আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই একই চিন্তা—সে হচ্ছে মহাত্মা দেশবন্ধুর দেহত্যাগ। কাগজে যখন এই দারুণ সংবাদ দেখি তখন এ দুটো চোখকে বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু হায়! সংবাদটা নিতান্তই নির্ম্মম সত্য। আমরা সমগ্র জাতিটাই যেন নিতান্ত হতভাগ্য বলে মনে হচ্ছে।

যে সব চিন্তা আমার অন্তরকে তোলপাড় করছে সে সব চিন্তাগুলি বাইরে প্রকাশ করে মনকে লাঘব করতে চাইলেও, আমায় কষ্টের সহিত সংযত হ'তে হবে। যে সব চিন্তা আজ মনে উদয় হচ্ছে সেগুলি এত পবিত্র, এত মূল্যবান যে, অচেনা লোকদের কাছে তা প্রকাশ করা যায় না—censor-দের ত অচেনা অজানা মনে না করে পারি না। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে সমগ্র দেশের ক্ষতি যদি অপূরণীয়ই হয়ে থাকে, বাঙ্গলার যুবকদের পক্ষে এ একটা সব চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ—সত্যই এটা আমাকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছে।

আজকের দিনে এত বিচলিত ও শোকাচ্ছন্ন হয়েছি এবং সেই সঙ্গে মনোজগতে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার এত কাছাকাছি নিজেকে অনুভব করছি যে, তাঁর গুণাবলী বিশ্লেষণ করে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা মোটেই সম্ভব নয়। আমি তাঁর অত্যন্ত কাছে থেকে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্ত্তগুলিতে তাঁর যে ছবি দেখেছিলাম, সময় এলে জগতের সামনে তার কথঞ্চিৎ আভাস দিতে পারব আশা করি। তাঁর সম্বন্ধে আমার মত যাঁরা অনেক কথাই জানেন, তারা, পারলেও, আজ কিছু বলতে সাহস করছেন না,

আশঙ্কা হয়, তাঁর মহত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে না পেরে পাছে তাঁকে ছোট করে ফেলেন।

তুমি যখন ফলতঃ এই কথাটাই বল যে, দুঃখ কষ্ট নয়, তখন আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। জীবনে অবশ্য এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে—এই যেমন এখন একটা আমাদের উপর এসে পড়েছে—সেগুলিকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পারি না। আমি এত বড় তত্ত্বজ্ঞানী বা এত বড় ভণ্ড নই যে, বলব আমি সকল প্রকার দুঃখ কষ্টই আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিতে পারি! সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভেবে দেখতে হয় যে, কতকগুলি এমন হতভাগ্যও আছে—হয় ত তারা সত্য সত্যই ভাগ্যবান—যারা সকল রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার জন্যেই যেন নির্দ্দিষ্ট আছে। বেশী কম যাইহোক, যদি কাউকে পাত্রভরে দুঃখ পান করতে হয় তাহলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পান করা ভাল। এমনি একটা আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণের ভার চীনের প্রাচীরের মত অদৃষ্টের সমস্ত আঘাত একেবারে ব্যর্থ ক'রে দিতে নাও পারে। কিন্তু এতে নিশ্চয়ই আমাদের স্বাভাবিক সহিষ্ণুতার শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে। Bertrand Russel যখন বলেছেন যে, জীবনে এমন সমস্ত ট্রাজেডি আছে যার হাত থেকে মানুষ নিষ্কৃতিই পেতে চায়, তখন ত তিনি খাঁটী সংসারী লোকের অভিমতই প্রকাশ করেছেন এবং আমার বিশ্বাস, যে, কেবল নিষ্কলঙ্ক সাধু ব্যক্তি অথবা সাধুত্বের ভাণ করে যে ভণ্ড, সে-ই এ কথার প্রতিবাদ করবে।

যারা ভাবুক বা তত্ত্বজ্ঞানী নয় তাদের যন্ত্রণাটা সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন মনে করাটা হয় ত তোমার ঠিক হচ্ছে না। তত্ত্বজ্ঞানহীনদের (abstract point of view থেকে আমি তাদের তত্ত্বজ্ঞানহীনই বলি) নিজেদেরও

একটা idealism আছে। তারা তাকে পূজার সামগ্রী মনে ক'রে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে ; নানাপ্রকার দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময় সেই ভালবাসার উৎস হতেই তারা সাহস ও ভরসা পায়। এখানে আমার সঙ্গে যারা কারাযন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা ভাবুক বা দার্শনিক নয়, তবুও তারা শান্তভাবে যন্ত্রণা ভোগ করে এবং বীরের মত সহ্য করে। Technical অর্থে তারা দার্শনিক না হতে পারে, কিন্তু তাদের আমি সম্পূর্ণরূপে ভাব-বিবর্জ্জিত মনে করতে পারি না। সম্ভবতঃ জগতের সর্ব্বত্র যারা কর্ম্মী তাদের সম্বন্ধে সাধারণতঃ এ-কথা খাটে।

সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে, অপরাধীদের যখন ফাঁসিকাঠে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তাদের একটা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য আসে এবং যারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রাণ দেয় তারাই শুধু বীরের মত মরতে পারে। এ ধারণাটা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচি যে, অধিকাংশক্ষেত্রেই সাধারণ অপরাধীরা সাহসের সহিত প্রাণ দেয়, এবং ফাঁসির দড়ি তাদের গলায় বসাবার আগে ভগবানের পায়েই আত্ম-নিবেদন করে। একেবারে ভেঙ্গে মুস্‌ড়ে পড়াটা বড় একটা দেখা যায় না। একবার এক কারাধ্যক্ষ আমাকে বলেছিলেন যে একজন ফাঁসির কয়েদী তাঁর কাছে স্বীকার করেছিল যে, সে একজনকে হত্যা করেছিল। সে তার কাজের জন্যে অনুতপ্ত কি না জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল যে, তার মোটেই অনুতাপ হয় নি, কারণ হত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার ন্যায্য অনুযোগ ছিল। তারপর সে বীরদর্পে ফাঁসিকাঠে উঠেছিল এবং প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু একটী পেশীর সঙ্কোচনও তার বুঝতে পারা যায় নি।

অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করে আমার চোখ ফুটে গেছে। আমার মনে হয়, মোটের উপর তাদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়। সেবারে অর্থাৎ ১৯২২ সালে যখন আমি জেলে ছিলাম, তখন একটা কয়েদী আমাদের yard-এ ভৃত্যের কাজ করত। সে সময়ে আমি মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর সহিত এক কারাপ্রাঙ্গণে একই ঘরে বাস করতাম। দেশবন্ধুর প্রাণটা ছিল খুবই কোমল, তাই সহজেই এই কয়েদীর দিকে তিনি কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সে একটা পুরাণ পাপী, আটবার তার সাজা হয়। কিন্তু সেও কেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই দেশবন্ধুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং আশ্চর্য্য রকমের শক্তির পরিচয় দেয়। কারামুক্তির সময় দেশবন্ধু তাকে বলেছিলেন যে, জেল থেকে মুক্তি পেলে সে যেন বরাবর তাঁর কাছে যায় আর তার পুরাণো সহকারীদের ছায়া যেন না মাড়ায়। কয়েদীটি রাজি হয়েছিল ও কথামত কাজও করেছিল। তুমি শুনলে আশ্চর্য্য হবে যে, যে ব্যক্তি এক সময়ে পুরাণো দাগী ছিল, সে এখন উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে তাঁর বাড়ীতে বাস করছে এবং মাঝে মাঝে অভদ্র মেজাজ তার দেখা দিলেও সে যে এখন শুধু অন্য মানুষ তাহা নয়, অধিকন্তু বেশ সরল ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে; এবং আজ এই ক্ষতি যাদের সব চেয়ে বেশী বেজেছে তাদের মধ্যে সেও একজন। অনেকে বলেন যে, মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনা দিয়ে তার মহত্ত্বের বিচার করা উচিত—এ-কথা যদি সত্য হয় তবে তাঁর দেশের কাজের দিকটা বাদ দিলেও স্বর্গীয় দেশবন্ধু একজন মহাপুরুষ ছিলেন।

আমি আমার আসল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি, এবং এখন আমার থামা উচিত। তোমার চিঠির জবাব লেখা এখনও শেষ করতে পারলাম না, কিন্তু আজকের ডাক ধরতে গেলে আমাকে এইখানেই

শেষ করতে হয়। আমি জানি তুমি আমার খবর পাবার জন্যে উদ্বিগ্ন থাকবে, সুতরাং আজকের ডাক ধরতেই হবে। পরের পত্রে আরও খবর লিখব। ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

দলাদলি ও বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ

[দক্ষিণ-কলিকাতা তরুণ সমিতির সহকারী সম্পাদক ও দক্ষিণ-কলিকাতা চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখিত]

মান্দালয় জেল

প্রিয়বরেষু,

আপনার ২।৫।২৬ তারিখের পত্র পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা করিবেন—আমি এখন অনেক বিষয়ে নিজের মালিক নহি—তা ত বুঝিতেই পারিতেছেন। আপনার পত্রে ভবানীপুরের সকল সমাচার অবগত হইয়া একসঙ্গে সুখী ও দুঃখিত না হইয়া পারি নাই। আজ বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই কেবল দলাদলি ও ঝগড়া এবং যেখানে কাজকর্ম্ম যত কম, সেখানে ঝগড়া তত বেশী। ভবানীপুরের কাজকর্ম্ম কিছু হইতেছে, তাই ঝগড়া বিবাদ অপেক্ষাকৃত কম—তবুও যা আছে তাহাতে নিরপেক্ষ লোক ম্রিয়মান না হইয়া পারে নাই। আমি

শুধু এই কথা ভাবি—ঝগড়া করিবার জন্য এত লোক পাওয়া যায়—কিন্তু মিলাইতে পারে, মীমাংসা করিয়া দিতে পারে—এ রকম একজন লোকও কি আজ সারা বাঙ্গালার মধ্যে পাওয়া যায় না? এই দলাদলির জন্য বাঙ্গলা আজ শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায়ের মত স্বদেশসেবক হারাইয়াছে—আরও কয়জনকে হারাইবে তা কে বলিতে পারে? বাঙ্গালী আজ অন্ধ, কলহে বিষাদে নিমগ্ন, তাই এই কথা বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। নিঃস্বার্থ আত্মদানের কথা আর তো কোথাও শুনিতে পাই না! অত বড় একটা প্রাণ নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া মহাশূন্যে মিশিয়া গেল; আগুনের ঝলকার মত ত্যাগ মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিল; সেই দিব্য আলোকের প্রভাবে বাঙ্গালী ক্ষণেকের জন্য স্বর্গের পরিচয় পাইল; কিন্তু আলোকও নিবিল, বাঙ্গালীও পুরাতন স্বার্থের গণ্ডীতে আশ্রয় লইল। আজ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র কেবল ক্ষমতার জন্যে কাড়াকাড়ি চলিতেছে। যার ক্ষমতা আছে—সে ক্ষমতা বজায় রাখিতেই ব্যস্ত। যার ক্ষমতা নাই সে ক্ষমতা কাড়িবার জন্য বদ্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বলিতেছে, "দেশোদ্ধার যদি হয়, তবে আমার দ্বারাই হউক, নয় তো হইয়া কাজ নাই।" এই ক্ষমতা-লোলুপ রাজনীতিকবৃন্দের ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া, নীরবে আত্মোৎসর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্ম্মী কি বাঙ্গলায় আজ নাই?

নিজেদের intellectual ও spiritual উন্নতি অবহেলা করিয়া যাহারা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহারা যে এই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কলহবিবাদে সকলকে মত্ত দেখিয়া নিতান্ত নিরাশ হইয়া রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নিজেদের মানসিক ও পারমার্থিক কল্যাণকে তুচ্ছ করিয়া যাহারা জনহিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছে

তাহারা কি শেষে এই ক্ষুদ্র ঝগড়া বিবাদের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিবে? জনসেবার আশায় নিরাশ হইলে তাহারা যদি পুনরায় নিজেদের পারমার্থিক কল্যাণে মনোনিবেশ করে তাহা হইলে কি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায়? আমি আজ স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যদি চলে, তবে বাঙ্গলার বহু নিঃস্বার্থ কর্ম্মী ক্রমে ক্রমে অনিলবরণের পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে।

আজ বাঙ্গলার অনেক কর্ম্মীর মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারী বুদ্ধি বেশ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, "আমাকে ক্ষমতা দাও—কর্ম্মচারীর পদ দাও—অন্ততঃপক্ষে কার্য্যকরি সমিতির সভ্য করিয়া দাও—নতুবা আমি কাজ করিব না।" আমি জিজ্ঞাসা করি—নরনারায়ণের সেবা ব্যবসাদারীতে, contract-এ কবে পরিণত হইল? আমি তো জানিতাম সেবার আদর্শ এই—

"দাও দাও ফিরে নাহি চাও,
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

যে বাঙ্গালী এত শীঘ্র দেশবন্ধুর ত্যাগের কথা ভুলিয়াছে—সে যে কতদিনের আগেকার স্বামী বিবেকানন্দের 'বীরবাণী' ভুলিবে—ইহা আর বিচিত্র কি?

দুঃখের কথা, কলঙ্কের কথা, ভাবিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়। প্রতিকারের উপায় নাই—করিবার ক্ষমতা নাই—তাই অনেক সময় ভাবি—চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করিয়া বাহ্যজগতের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ করিয়া দিই। পারি তো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইব। তারপর মাথার উপরে যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়,

তবে আমাদের হৃদয়ের কথা দেশবাসী এক দিন না একদিন বুঝিবেই বুঝিবে। দেশের নামে এত বড় একটা প্রহসনের অভিনয় দেখিব—বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা দেশে যে 'Nero is fiddling while Rome is burning' কথার একটা নূতন দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিবে—কোনও দিন ভাবি নাই।

অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম—হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আপনাদের নিতান্ত আপনার বলিয়া মনে করি তাই এত কথা বলিতে সাহস করিলাম। আপনারা গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত—আশা করি, আপনারা এই দলাদলির পঙ্কিল আবর্ত্তে আকৃষ্ট হইবেন না।

বিদ্যালয়ের কথা পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। বাড়ীর কথা শুনিয়া অবশ্য দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না। তবে এ-কথা আমি পূর্ব্ব হইতে জানি এবং চণ্ডীবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে কয়েকবৎসর পূর্ব্বেই বাড়ীটির পরিণামের কথা বলিয়াছিলাম। আমার সর্ব্বদা মনে হইত যে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা unbusiness like ভাবে জমির "লিজ" লইয়া বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তার ফলে পরিণামে জমিদারেরই লাভ হইবে। যাক, এখন ত "গতস্য শোচনা নাস্তি"। আপনারা যে কিছুমাত্র নির্ভরসা না হইয়া 'গৃহনির্ম্মাণ-ভাণ্ডার' সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা খুব আশাপ্রদ। আপনাদের চেষ্টা যে সফল হইবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কারণ—

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি।"

সমিতির সকল সংবাদ পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। আপনারা যদি মেথর মুচি প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় করিতে পারেন তবে বড় ভাল হয়। এ বিষয়ে অমৃতের সহিত

পরামর্শ করিবেন—আমি অনেক দিন হইল তাহার পত্র পাইয়াছি, দুঃখের বিষয় উত্তর দিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ কুলদাকে দিলাম—আশা করি আগামী সপ্তাহে অমৃতকে লিখিতে পারিব।

বলা বাহুল্য আমি থাকিলে আপনাদের আলাদা হইতে দিতাম না। অবশ্য ভিন্ন শাখা গঠনের সহায়তা আমি করিতাম কিন্তু একেবারে ভিন্ন নাম দিয়া নূতন প্রতিষ্ঠান করিতে দিতাম না। যাক, এখন আর উপায় নাই। যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে—এই বলিয়া কাজে লাগিতে হইবে। আপনারা constitution করিয়া ভালই করিয়াছেন।

আশা করি চাউল ও চাঁদা গ্রহণ লইয়া বালক সমিতির সহিত আপনাদের গণ্ডগোল হইবে না। এক জায়গায় যদি অনেকগুলি সমিতি চাঁদা ও চাউল গ্রহণ আরম্ভ করে তবে গৃহস্থেরা উত্যক্ত হইয়া ওঠে, সুতরাং সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখা দরকার।

আমার মনে হয় যে, আপনারা যদি ২।১ জন কর্ম্মী বা শিক্ষককে কাশীমবাজার পলিটেকনিক (Cossimbazar Polytechnic) স্কুলে শিখাইয়া লইতে পারেন তবে technical শিক্ষার খুব সুবিধা হইবে। আমি একবার কাশীমবাজার স্কুলে গিয়াছিলাম। আমার বেশ ভালই লাগিয়াছিল—তাহারা কয়েকটী নূতন জিনিষ শেখায় যাহা সাধারণ স্কুলে হয় না—যেমন বেতের কাজ clay-modelling পুতুল নির্ম্মাণ, কামারের কাজ, সেলাই, electroplating ইত্যাদি। আমি যখন যাই তখন electroplating-এর জন্য machinery-র আমদানি হইতেছে।

আপনার প্রেরিত বিদ্যালয় ও সমিতির constitution আমি পাইয়াছি।

স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ ভাল হইতেছে না—ইহা দুঃখের বিষয়। এর

কারণ এই যে, জনসাধারণকে ঠিকভাবে ডাকা হয় নাই। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তাহারা সাড়া না দিয়া পারিবে না। তাহাদের মধ্যে intuition ও কর্ম্ম-প্রেরণা জাগানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্যবিভাগের উদ্দেশ্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাহাদের মধ্যে কর্ম্ম-প্রেরণা জাগাইতে হইলে তাহাদিগকে ভালবাসার দ্বারা আপনার করিতে হইবে।

আপনারা হয় তো জানেন না যে, দক্ষিণ-কলিকাতা সেবাশ্রমের ত্রুটির জন্য আমি প্রধানতঃ দায়ী। বাহিরে থাকিতে আমি ভাল রকম organise করিতে পারি নাই। তারপর হঠাৎ আমার গ্রেপ্তার। যখন সেবাশ্রম কালীঘাটে ছিল তখন বাড়ী-ভাড়া ও সহকারী সম্পাদকের বেতন আমি নিজে দিতাম। শুধু বালকদের ভরণপোষণের খরচ সাধারণের দেওয়া চাঁদা হইতে নির্ব্বাহিত হইত। সেবাশ্রম সম্বন্ধে আমার clear conscience আছে, কারণ public-এর দেওয়া টাকার একটী পয়সারও আমি অসদ্ব্যবহার করি নাই। আমার গ্রেপ্তারের পর আমার দেয় অংশ আমার দাদা (শরৎবাবু) দিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি খরচ কমিয়াছে এবং আয় বাড়িয়াছে বলিয়া তাঁহাকে আর পূর্ব্বেকার মত টাকা দিতে হয় না। আমি যখন মাসে মাসে দুই শত টাকা করিয়া সেবাশ্রমের জন্য ব্যয় করিতাম, তখন অনেক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, আমি বৃথা ছয় সাতটী বালকের জন্য এত অর্থব্যয় করিতেছি। এ টাকার সদ্ব্যবহার অন্যভাবে হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, আমি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সেবাশ্রমের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আজ প্রায় ১২।১৪ বৎসর ধরিয়া যে গভীর বেদনা তুষানলের মত আমাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্য আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ

করিয়াছি। আমি কংগ্রেসের কাজ ছাড়িতে পারি—তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। "দরিদ্র নারায়ণের" সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ আমি কোথায় পাইব? এই সেবাশ্রমের পেছনে কত ইতিহাস লুক্কায়িত আছে—কবে এই চিন্তা আমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং কেন প্রবেশ করে—কি করিয়া আমি চিন্তারাজ্য ছাড়িয়া কর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করি—সে কথা অন্য সময় বলিব। পত্রে লিখিবার চেষ্টা করিলে গ্রন্থ হইয়া যাইবে।

অনেক কথা লিখিলাম। এখন শেষ করি। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি উত্তর দিব? রবিবাবুর একটী কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। কবির ভাষায় উত্তর দিলে কি ধৃষ্টতা হইবে? কবির এত আদর এইজন্য যে, আমাদের অন্তরের কথা কবিরা আমাদের অপেক্ষা স্পষ্টতর ও স্ফুটতর ভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন। তাই বলি—

"এখনো বিহার কল্পজগতে
জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্ম্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্ম্মবাণী।

*　　*　　*

মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে

*　　*　　*

গড়িতেছি মন আপনার মনে
যোগ্য হতেছি কাজে!

*   *   *

কবে প্রাণ খুলি বলিতে পারিব
"পেয়েছি আমার শেষ !"
তোমরা সকলে এস মোর পিছে
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ !"

শরীর তত ভাল নাই, তবে তার জন্য চিন্তাও নাই। আমার ভালবাসা ও প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন। অমৃত প্রভৃতি ভাইরা কেমন আছেন ? আপনাদের কুশল সংবাদ পাইলে অত্যন্ত সুখী হইব। তবে কাজের সময় নষ্ট করিয়া পত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই। আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট

[হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত ইংরেজী চিঠির অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ]

মান্দালয় জেল

আমি আপনাদের ইস্তাহার ও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত লিখিত তাহার প্রতিবাদ-পত্র পাঠ করিয়াছি ; এ পর্য্যন্ত সেনগুপ্তের প্রতিবাদের কোন প্রত্যুত্তর দেখি নাই। প্যাক্টকে পুনরায় গ্রহণ করিবার কথা উঠিতেই পারে না। গত সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীতে যখন প্যাক্ট গৃহীত

হয়, তখনও ইহার বিরুদ্ধে একদল মূক প্রতিবাদী ছিলেন এবং দেশবন্ধু তাহা জানিতেন; শুধু গোপনে নয়, প্রকাশ্যেও ৺দেশবন্ধু বার বার স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য দেশের দুই সম্প্রদায়ের মিলনের একটী স্পষ্ট ভিত্তি স্থাপন করা।

এই জন্য উক্ত প্যাক্ট-এর দুই একটী অংশ বা বিধি যদি উদ্দেশ্যসাধনের পরিপন্থী বা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সেগুলির পরিবর্ত্তনে তাঁহার আপত্তি ছিল না। যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে মনে হয়, গত কোকনদ কংগ্রেসে তিনি এরূপও বলিয়াছিলেন, যে বেঙ্গল প্যাক্ট এখনই কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত হোক, তিনি ইহা চান না। তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই ছিল যে, উক্ত প্যাক্ট যেন নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটি দ্বারা আলোচিত হয়।

কিন্তু তখন সমগ্র কংগ্রেস ইহার ঘোরতর বিরোধী ছিল এবং কংগ্রেসের সভ্যগণ তখন প্যাক্ট আলোচনা করিলেও স্বীকৃত হন নাই। কোকনদ কংগ্রেসের পর সিরাজগঞ্জ সম্মিলনীতে প্যাক্ট গৃহীত হয়। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু প্যাক্ট গ্রহণের পূর্ব্বেও দেশবন্ধু সকলকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, তিনি প্যাক্ট সম্পর্কে কোনরূপ তর্ক বা আপোষের কথা শুনিবেন না, এরূপ নয়; বরং তিনি প্যাক্টএর কোনও কোনও অংশ বা বিধির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে স্বীকৃত ছিলেন।

আমার এই জন্য মনে হয়, দেশবন্ধুর অনুরক্ত ভক্ত হইয়াও প্যাক্টএর কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার দাবী করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি ইহাও মনে করি, মাত্র দেশবন্ধুকে লইয়া বা তাঁহার মৃত্যুর পর হাতজোড় করিয়া নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির মুখ চাহিয়া

বাঙ্গলার সমস্যার মীমাংসার জন্য বসিয়া থাকিলে চলিবে না। হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা নিখিলভারতের দিক হইতে মীমাংসিত হইলেও বাঙ্গলার সমস্যা বাঙ্গালীকেই সমাধান করিতে হইবে।

সংবাদপত্র পাঠে যতদুর সম্ভব আমি বর্ত্তমান ঘটনাস্রোত অনুসরণ করিয়া কয়েকটী দৃঢ় ধারণা লাভ করিয়াছি। বর্ত্তমানের বিপদসঙ্কুল সময়ে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অভাব—সকল বিষয়ে স্পষ্ট দূরদর্শিতা। ......ইতি—

কারামুক্তির প্রস্তাবের উত্তর

[জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে লিখিত ইংরেজী পত্রের বঙ্গানুবাদ]

ইনসিন সেণ্ট্রাল জেল

৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৭

দাদা,

মিঃ মোবার্লীর প্রদত্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার কি মত তাহা জানিবার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন এবং আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করিবারও সময় আসিয়াছে। আমার মতের সহিত আপনাদের মত মিলিবে কিনা জানি না; তবু আমার মতের মুল্য যাহাই হউক না কেন, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

আমি মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাব বারবার অতি সযত্নে পাঠ করিয়াছি। তাঁহার উচ্চারিত প্রতি শব্দ প্রতি কথা বারবার করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি অতি সাবধানতার সহিত তাঁহার বক্তব্যে বাক্য-সংযোজনা করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের সকল দিক অতি ধীরভাবে চিন্তা করিবার পর আজ আমার নিজস্ব মত জ্ঞাপন করিতেছি, ক্ষণিক ঝোঁকের বশে হঠাৎ কোনও নির্দ্ধারণ করি নাই। এখন আমি আপনাকে যাহা লিখিতেছি তাহা বারবার গভীরভাবে চিন্তার পর নির্দ্ধারণ করিয়াছি। কিন্তু তথাপি আমার যদি কোন ভুল হইয়া থাকে, কিংবা আমার তর্ক-নীতিতে যদি কিছু যোগ করিতে ভুল করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহা স্বীকার করিয়া পুনর্বিবেচনা করিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, মিঃ মোবার্লীর স্পষ্টবাদিতার আমি খুব প্রশংসা করি এবং আমার মনে হয়—তাঁহার ন্যায় আমিও যদি স্পষ্টভাবে সকল কথা প্রকাশ না করি তাহা হইলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে, আমার কর্ত্তব্যও যথাযথরূপে পালিত হইবে না। স্পষ্টবাদিতায় আমি সর্ব্বদাই বিশ্বাস করি এবং আমার মনে হয় সকল কথা খোলাখুলি বলিলে শেষে উভয় পক্ষেরই সর্ব্বাপেক্ষা উপকার দর্শায়।

মিঃ মোবার্লীর কয়েকটী কথায় আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না। যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, আমার অতীত কার্য্য-কাহিনী বা ভবিষ্যৎ কার্য্যপন্থার কোন স্বীকারোক্তি চাহেন না—যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, আমি যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে মুক্তি দিবেন—শেষের দিকে যেখানে তিনি বলিতেছেন যে, তিনি এ প্রস্তাব প্রথমে আমার নিকট উত্থাপিত করেন নাই, কারণ তাহা হইলে মনে হইতে পারে যে, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে আমাকে বাধ্য করানো হইতেছে—সে সকল পাঠ করিয়া বুঝিলাম তিনি আমাকে বু

আত্মসম্মান-বিশিষ্ট ভদ্রলোক হিসাবে যথেষ্ট মান্য করিয়াছেন এবং নিম্ন-লিখিত কারণগুলির জন্য তাঁহার এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে না পারিলেও তাঁহার প্রস্তাবের সম্মানজনক অংশগুলি আমি উপলব্ধি করি। পরিশেষে বঙ্গীয় আইন-সভার সদস্যরূপে আমি মাননীয় সভ্যের এরূপ ব্যবহারকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।। কারণ আমার মনে হয় কাউন্সিলের সভ্যগণের প্রতি আস্থাস্থাপন করিয়া কোনও প্রস্তাব তাঁহাদের নিকটই সর্ব্বপ্রথমেই উপস্থাপিত করার নিদর্শন বোধ হয় ইহাই প্রথম।

আমার মনে হয় মিঃ মোবার্লীর প্রস্তাবের স্বপক্ষে আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

প্রথমেই একটী বিষয় সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা মন হইতে দূরীভূত করিতে চাই—ছোটদাদার (ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর) রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে আমার মতামতের কোনই সম্পর্ক নাই, কারণ তিনি রিপোর্ট লিখিবার পূর্ব্বে বা পরে কি লিখিবেন বা আমার জন্য কি অনুমোদন করিবেন তদ্বিষয়ে কোন কথা পরামর্শ আমার সঙ্গে হয় নাই। আমাকে যদি পূর্ব্বে জানাইতেন তাহা হইলে আমি অবশ্যই সুইট্জারল্যাণ্ডে পাঠাইবার প্রস্তাব অনুমোদনের বিপক্ষে মত দিতাম।

ঐরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইবার পর যখন তিনি তাহা আমাকে জানাইলেন আমি তখনই সন্দেহ করিয়াছিলাম ইহার ফল ভাল হইবে না এবং পরে আমার এ সন্দেহই সত্য হইয়াছে। অবশ্য ছোটদাদা ডাক্তার হিসাবে আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং ডাক্তার হিসাবে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়া আমার মনে হয় প্রকৃত সমদর্শী চিকিৎসক এবং অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের মত ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অনুমোদনের কিরূপ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সরকারই বা এ

অনুমোদনকে কিরূপভাবে রাজনৈতিক চাল চালিবার জন্য ব্যবহার করিবেন তাহা বিচার করিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার ছিল না ; তজ্জন্য আমিও তাঁহার এ কার্য্যের নিন্দা করিতে পারি না। তাঁহার কয়েকজন রোগী সুইস্ স্বাস্থ্যাশ্রমে গিয়া রোগমুক্ত হইয়াছে তাহা দেখিয়াই তিনি আমার সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন—অন্যান্য যক্ষারোগীকেও যেরূপ করিয়া থাকেন। যে সকল অর্থবান্ রোগী সুইট্জারল্যাণ্ডের বাস ও শুশ্রূষার ব্যয় বহন করিতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে এ প্রস্তাবই শ্রেষ্ঠ। এ অবস্থায় আমি যে কোনরূপে নিজেকে কোন প্রস্তাব পালনে বাধ্য করি নাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

দেখা যাইতেছে, সরকার ছোটদাদার প্রদত্ত রোগবিবরণ গ্রহণ করেন নাই, যদিও তাঁহার প্রদত্ত স্বাস্থ্য অর্জ্জন উপায় গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ মিঃ মোবার্লী স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সুভাষচন্দ্র যে অত্যধিক পীড়িত হন নাই এবং একেবারে কর্ম্মশক্তিহীন হন নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।" আমার জানিতে কৌতুহল হয়, সরকার কবে আমাকে 'অত্যধিক পীড়িত" বা "একেবারে কর্ম্মশক্তিহীন" মনে করিবেন। যেদিন সকল চিকিৎসক ঘোষণা করিবেন আমার রোগমুক্তি অসম্ভব এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে, সেইদিন কি ? তা ছাড়া, ছোটদাদার রোগ-বিবরণ যদি তাঁহারা স্বীকার করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে যাহা মাত্র বাহ্যতঃ তাহার অনুমোদন—তাহা গ্রহণ করিতেই বা সরকার এত ব্যস্ত কেন ? ছোটদাদা এ অনুমোদন করেন নাই যে, আমাকে বাড়ীতে যাইতে দেওয়া হইবে না বা বিদেশে যাইবার পূর্ব্বে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে পাইব না। তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, আমি যে জাহাজে যাইব তাহা কোন ভারতীয় বন্দরে নোঙর করিতে পারিবে না।

তিনি এ-কথাও বলেন নাই যে, যদি আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার হয় তাহা হইলে যত দিন অর্ডিনান্স আইন থাকিবে ততদিন দেশে থাকিতে পারিব না। এই সকল দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়, সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের ব্যবস্থা নয়।

মিঃ মোবার্লী প্রকৃতপক্ষে বলিয়াছেন যে, দুইটি পথ অবশিষ্ট আছে তাহা (১) জেলে বন্দী হইয়া অবস্থান কিংবা, (২) কোন বিদেশে যাইয়া স্বাস্থ্য অর্জ্জনের চেষ্টা ও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থান।

কিন্তু সত্যই কি এই দুয়ের মধ্যে অন্য কোন মধ্যপন্থা অবশিষ্ট নাই? আমার তা মনে হয় না। সরকারের ইচ্ছা যে আমি অর্ডিনান্স আইন উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, অর্থাৎ জানুয়ারী ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত—বন্দী থাকি। কিন্তু এ আইন যে ১৯৩০ সালের পরও পুনরায় নূতন করিয়া আলোচনা হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গত অক্টোবর মাসে সি, আই, ডি পুলিসের কর্ত্তা মিঃ লোম্যানের সহিত এ প্রসঙ্গে আমার কথা হইয়াছিল তাহা একেবারেই আশাপ্রদ নয়। এবং ১৯২৯ সালে যদি এই অর্ডিনান্স আইনে চিরকালের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিবার আন্দোলন হয় তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইব না। তাহা হইলে আমাকে চিরস্থায়ী ভাবে বিদেশে বাস করিতে হইবে এবং এইরূপ নির্ব্বাসনের জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করিতে হইবে। যদি এ সম্বন্ধে সরকারের সত্যই কোন স্পষ্ট ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আমি কবে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব, সে কথাও ঐ প্রস্তাবে উল্লিখিত থাকিত।

তারপর প্রবাসে আমি কিরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইব তাহার কোনও স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায় নাই। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যাঁকে

ঝাঁকে যে সকল সি, আই, ডি বিচরণ করে, ভারত-সরকার কি আমাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমি রাজনৈতিক সন্দেহে অভিযুক্ত এবং যতদিন না মত পরিবর্ত্তন করিয়া পুলিস গোয়েন্দা হইতেছি ততদিন সরকার আমাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিবেন এবং ইহা খুব সম্ভব যে, এই সকল গোয়েন্দা আমাকে প্রতি পাদক্ষেপে অনুসরণ করিয়া আমার জীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিবে।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে শুধু বৃটিশ গোয়েন্দা নাই, তথায় বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সুইস, ইটালীয়, ফরাসী, জার্ম্মান ও ভারতীয় গোয়েন্দা আছে এবং কোনও কোনও উগ্র উৎসাহী গোয়েন্দা আমাকে যে সরকারের কাছে গভীর কালিমাময় করিবার জন্য মিথ্যা ঘটনার সুবিস্তৃত বর্ণনা দিবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমি গত বৎসর মিষ্টার লোম্যানকে বলিয়াছিলাম, গোয়েন্দা বিভাগ ইচ্ছা করিলে যে কোন লোকের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহাকে কোনরূপ অর্ডিনান্সে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। ইউরোপ হইতে এরূপ করা আরও সহজ। বিদেশে যাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখা হইত, তাঁহাদের ভারতে ফিরিতে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিলাতের পার্লামেন্টের ও মন্ত্রী-সভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বিশেষভাবে চেষ্টা না করিলে লালা লাজপৎ রায়ের ন্যায় নেতাও দেশে ফিরিতে পারিতেন না। সরকার যখন আমাকে একবার সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়াছেন, তখন আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ হইবে সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি জানি, পুলিসের গোয়েন্দারা এ বিষয়ে একটু অধিক কার্য্য-

তৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। আমি ইউরোপে যত শান্তভাবে এবং সাবধানতার সহিত বাস করি না কেন, তাঁহারা ভারত-সরকারের নিকট আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রিপোর্ট পাঠাইবেন, আমি কিছু না করিলেও এবং খুব শান্তভাবে থাকিলেও তাঁহারা আমাকে ভীষণ ষড়যন্ত্রের কর্ত্তা বলিয়া রিপোর্ট দিবেন, তাঁহারা কি রিপোর্ট দিতেছেন, তাহার কিছুই আমি জানিতে পারিব না। কাজেই কোন কালে সে সম্বন্ধে সত্য প্রকাশের বা আমার বিবরণ প্রদানের সম্ভাবনা থাকিবে না। এইরূপ ভাবে ইহা খুব সম্ভব যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ আসিবার পুর্ব্বেই তাঁহারা আমাকে একজন বড় বলশেভিক-নেতা বলিয়া জাহির করিয়া দিবেন এবং তাহার ফলে হয়ত আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে, কারণ ইউরোপের লোক বর্ত্তমানে এক বলশেভিককেই ভয় করে। এই জন্যই আমি স্বেচ্ছায় আমার জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইতে ইচ্ছা করি না। সরকারপক্ষও যদি আমার দিক হইতে একবার এ বিষয়ে আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

যদি আমার বলশেভিক এজেণ্ট হইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আমি সরকার বলিবামাত্র প্রথম জাহাজেই ইউরোপ যাত্রা করিতাম। তথায় স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর বলশেভিক দলে মিশিয়া সমগ্র জগতে এক বিরাট বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে প্যারিস হইতে লেলিনগ্রাড পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতাম ; কিন্তু আমার সেরূপ কোন ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নাই। যখন শুনিলাম যে, আমাকে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইবে না, তখন বার বার মনে মনে ভাবিলাম সত্যই কি আমি ভারতে ব্রিটিশ শাসনরক্ষার পক্ষে এতই বিপজ্জনক যে, বাঙ্গলা দেশ হইতে

নির্ব্বাসিত করিয়াও সরকার সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, অথবা সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি? যদি প্রথম কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ব্যুরোক্রেশীর নিকট সেরূপ ভয়ের কারণ হওয়া আমার পক্ষে শ্লাঘার কথা। কিন্তু পরক্ষণেই যখন আমি আমার নিজ জীবন ও কার্য্যাবলীর কথা মনে মনে চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে, একদল স্বার্থান্ধ হিংসাপরায়ণ লোক আমাকে যে ভাবে দেখিতেছেন আমি প্রকৃতই সেইরূপ নহি। আমি বাঙ্গলার বাহিরে কোন রাজনীতিক কার্য্য করি নাই এবং ভবিষ্যতে করিব বলিয়াও মনে করি না, কারণ বাঙ্গলাকেই আমি আমার কার্য্যক্ষেত্র ও আদর্শের পক্ষে বিরাট বলিয়া মনে করি। বাঙ্গলা সরকার ছাড়া অন্য কোন সরকারের আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ছয় বৎসরের মধ্যে আমি কংগ্রেসে যোগদান ও পারিবারিক কারণ ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে বাঙ্গলার বাহিরে যাই নাই। তবে কেন আমাকে সমস্ত ভারত, ব্রহ্মদেশে ও সিংহলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইতেছে? সিংহল ত খাস বৃটিশ উপনিবেশ, ভারত-সরকারের নিষেধ-আজ্ঞা আইনানুসারে তথায় খাটিবে কি না সন্দেহ।

বাঙ্গলা-সরকার এখন আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন। আমি যখন স্বাধীন ছিলাম, তখনই বা আমার কি গতিবিধি ছিল? ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের মধ্যে আমি মাত্র দুইবার কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম। প্রথম খুলনা জিলা-কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য এবং দ্বিতীয় নদীয়া জিলার কাউন্সিল নির্ব্বাচনে একজন সভ্যপদপ্রার্থীর পক্ষে বক্তৃতা করিবার জন্য। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবরের মধ্যে আমি একবারও

কলিকাতার বাহিরে যাই নাই। আমাকে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সের সহিত জড়াইবার নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কনফারেন্সের সময় আমি কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসাররূপে মিউনিসিপ্যাল কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক কন্‌ফারেন্সের সময় কলিকাতায় ঝাড়ুদারদিগের ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা হওয়ায় আমার পক্ষে এক মিনিটের জন্যও কলিকাতা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত আমি যাহা করিয়াছি তাহা সকলেই অবগত আছেন। সে সময় আমার সর্ব্বপ্রকার গতিবিধির কথা সরকার জানিতেন। আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করাই আমাকে যদি গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, আমাকে গ্রেপ্তার করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মিষ্টার মোবার্লী একটী বিষয়ে বিশেষ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। সরকার জানেন যে, প্রায় আড়াই বৎসর কাল আমি নির্ব্বাসিত আছি—এই সময়ের মধ্যে আমি আমার কোন আত্মীয়, এমন কি পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাকে আরও আড়াই বা তিন বৎসরকাল বিদেশে থাকিতে হইবে, সে সময়েও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের কোন সুবিধা হইবে না। ইহা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের পক্ষে আরও অধিক কষ্টদায়ক। প্রাচ্যের লোকেরা তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের সহিত কিরূপ গভীর স্নেহের বন্ধনে জড়িত থাকেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশীয় কাহারও পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নহে। আমার মনে হয়, এই অজ্ঞতার জন্যই সরকার এইরূপ হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশীয়েরা মনে করেন, যেহেতু আমার বিবাহ হয়

নাই, অতএব আমার পরিবার থাকিতে পারে না এবং কাহারও প্রতি আমার ভালবাসাও থাকিতে পারে না।

গত আড়াই বৎসর আমাকে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে, সরকার বোধ হয় তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমিই কষ্ট পাইয়াছি—তাঁহারা নহেন। বিনা কারণে তাঁহারা এতদিন ধরিয়া আমাকে আটক রাখিয়াছেন। আমাকে তবু বলা হইয়াছিল, যে অস্ত্র-শস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রভৃতি আমদানী, সরকারী কর্ম্মচারী হত্যা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমি অপরাধী। ঐ সম্বন্ধে অনেকে আমার বক্তব্য জানাইতে বলিয়াছিলেন। আমি উত্তরে জানাইতেছি যে, আমি নির্দ্দোষ। আমার বিশ্বাস, পরলোকগত স্যর এডওয়ার্ড মার্শাল হল বা স্যর জন সাইমন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়বার অভিযোগগুলি আমার নিকট উপস্থিত করা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এত লোক থাকিতে পুলিশ আমাকে ধরিল কেন? আমার মনে হয়, উহাই সন্তোষজনক উত্তর। আমার গ্রেপ্তারের পর হইতে বাঙ্গলা সরকার আমার অধীন ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালনের জন্য বা আমার গৃহাদি রক্ষার জন্য কোনরূপ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন নাই। ঐ বিষয়ে আমি বড়লাটের নিকট আবেদন করিলে বাঙ্গলা সরকার সে আবেদন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। তারপর আবার আমাকে তিন বৎসর বিদেশে থাকিতে বলা হইতেছে। ইউরোপে নির্ব্বাসনের সময় আমার নিজের খরচ নিজেকে জোগাইতে হইবে। এ কিরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব, তাহা বুঝিতে পারি না। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আমার যেরূপ স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমাকে অন্ততঃ সেইরূপ স্বাস্থ্যবান করিয়া সরকারের মুক্তিদান করা উচিত। কারাবাসের জন্য আমার স্বাস্থ্যহানি

হইলে সরকার কি তাহার ক্ষতিপূরণ দিবেন না? ইউরোপে যতদিন হৃতস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত না হই, ততদিন আমার সকল খরচ সরকারের বহন করা উচিত। কতদিন সরকার এই সকল বিষয়ে অনবহিত থাকিবেন? সরকার যদি ইউরোপ যাইবার পূর্ব্বে আমাকে একবার বাড়ী যাইতে দিতেন, যদি ইউরোপে আমার সকল ব্যয়ভার বহন করিতেন ও রোগমুক্তির পর আমাকে বিনা বাধায় দেশে ফিরিতে দিতেন, তাহা হইলে এই দান সহৃদয়তার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতাম।

মিঃ মোবার্লী বলিয়াছেন, সরকার ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অর্ডিনান্স আইনের কার্য্যকাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সরকার সুভাষচন্দ্রকে আটক রাখিতে পারেন। এ বিষয়ে আমি মিঃ মোবার্লীর সহিত একমত। আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে যত-দিন ইচ্ছা আমাকে আটক রাখিতে পারেন। অর্ডিনান্স আইনের কার্য্যকাল শেষ হইলে তাঁহারা আমাকে তিন আইনে বা অন্য যে-কোনও উপায়ে আটক রাখিতে পারেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা লাফালাফি করুন না কেন বা শাসনপরিষদের সদস্যদিগের সফরের ব্যয় না-মঞ্জুর করুন না কেন, আমি জানি যে, সরকার ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে যাবজ্জীবন আটকাইয়া রাখিতে পারেন। সরকার আমাকে চিরকাল আটক রাখিতে চাহেন কি না তাহাই আমি জানিতে চাই। পরলোকগত দেশবন্ধু দাশ মহাশয় আমাকে যুবক-বৃদ্ধ বলিয়া ডাকিতেন। তিনি আমাকে নৈরাশ্যবাদী স্থির করিয়াছিলেন। একটি বিষয়ে আমি নৈরাশ্যবাদী বটে, কারণ আমি সকল ঘটনার অশুভটাই বড় করিয়া দেখি। বর্ত্তমান ঘটনার সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ ফল কি হইতে পারে, তাহাও আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমি মনে স্থির করিয়াছি, জন্মভূমি হইতে

চিরকালের জন্য নির্ব্বাসন অপেক্ষা জেলে থাকিয়া মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়ঃ। এই অশুভ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াও আমি নিরুৎসাহ হই নাই। কারণ, কবির উক্তিতে আমি বিশ্বাস করি ঃ—

গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়।

সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে ও বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা আমি সবই বলিয়াছি। আমার মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত বলিয়া কেহ যেন দুঃখিত না হয়েন। পিতামাতার কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেজন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। মুক্তিলাভের পূর্ব্বে আমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি নিজে শান্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারভাবে সকল অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাদের সমগ্র জাতির কৃতপাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি—ইহাতেই আমার তৃপ্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইয়া থাকিবে—আমাদের মনোবৃত্তি জাতির স্মৃতি হইতে কখনও মুছিয়া যাইবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের প্রিয় কল্পনার উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ ও অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া কাল কাটাইতে পারিব।

অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রের উত্তর শীঘ্র দিবেন। ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

জীবনের লক্ষ্য

ইনসিন জেল

৬ই মে, ১৯২৭

[জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট লিখিত চিঠির বঙ্গানুবাদ]

দাদা,

দীর্ঘ পত্র লিখিবার সামর্থ্য আমার নাই; আবশ্যক শক্তি সংগ্রহ করিতে না পারা পর্য্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে বড়দাদার সহিত আমার অনেক আলাপ হইয়াছে। আমার এই আলাপের সুযোগ দেওয়ায় আমি আন্তরিক আনন্দিত হইয়াছি। মান্যবর স্বরাষ্ট্র-সচিব মহোদয় যে সৌজন্য দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার সহিত এ পর্য্যন্ত যেরূপ ব্যবহার করা হইতেছিল এই ব্যবহার তাহা হইতে পৃথক।

গবর্ণমেন্টের উত্তর, বড়দাদা ২৭শে এপ্রিল তারিখে আমাকে জানাইয়াছিলেন। এই উত্তরে বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই স্পষ্টতর হইয়াছে। ১১ই এপ্রিল তারিখে গবর্ণমেন্টের সর্ত্তের আমি যে উত্তর দিয়াছিলাম, বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমি পুনরায় সেই উত্তরই ঠিক বলিয়া মনে করিতেছি।

আমার সিদ্ধান্ত—সহজ বিচারের ফল। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ়তর হয়। * * * জীবনকে

সহজভাবে বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। ভাল ভাবে বিচার করিবার পর এই সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ় হইয়াছে। কারাগারে আমার যতই দিন যাইতেছে ততই আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়মুল হইতেছে যে, জীবন-সংগ্রামের মুলে রহিয়াছে মতবাদের সংঘর্ষ—সত্য এবং মিথ্যা ধারণার সংঘর্ষ। কেহ কেহ ইহাকে সত্যের বিভিন্ন স্তর বলিয়া থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত ধারণা নিষ্ক্রিয় নহে, ক্রিয়াশীল এবং সংঘর্ষাত্মক। হেগেলের Absolute Idea, হপম্যান ও সোপেনহারের Blind Will এবং হেনরি বার্গসঁর 'Iean Vital'-এর মতই এই সমস্ত ধারণা ক্রিয়াশীল। এই সমস্ত ধারণা নিজেদের পথ নিজেরা সৃষ্টি করিয়া লইবে। আমরা তো মাটির পুতুল মাত্র, ভগবানের তেজরাশির কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র আমাদের মধ্যে নিবদ্ধ। আমাদিগকে এই ধারণার নিকট আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

ঐহিক এবং জড় দেহের সুখদুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া যে এইভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে জীবনে তাহার সফলতা অবশ্যম্ভাবী। আমার আদর্শ যে একদিন জয়ী হইবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমার স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কোন চিন্তাই করি না।

গবর্ণমেণ্টের সর্ত্তের উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে আমি আমার মত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্টতর সর্ত্ত পাইবার জন্য পাটোয়ারী চাল দিতেছি বলিয়া কোন কোন সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্দয়তায় আমি দুঃখিত। আমি দোকানদার নহি, দর কষাকষি আমি করি না। কুট চালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা করি। আমি একটা আদর্শ ধরিয়া দণ্ডায়মান। ব্যস্, এইখানেই শেষ। আমি জীবনকে এতটা প্রিয় মনে করি না যে, তাহা রক্ষার জন্য

আমি চালাকির আশ্রয় লইব। মূল্য সম্বন্ধে আমার ধারণা বাজারের ধারণা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। শারীরিক বা বৈষয়িক সুখের নিরিখে জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ণয় করা যায় বলিয়া আমি মনে করি না। আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তির নহে। বৈষয়িক লাভও আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নহে। সেণ্ট পল বলিয়াছেন—

"আমরা রক্তমাংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি। আমাদের সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধে, যাহারা পৃথিবীর অন্ধকারের নায়ক, আমাদের সংগ্রাম উচ্চপদাধিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে।" স্বাধীনতা এবং সত্যই আমাদের আদর্শ, রাত্রির পর যেমন দিন আসে, আমাদের চেষ্টাও ঠিক তেমনি সত্য সত্য সফল হইবেই। আমাদের শরীর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অটল বিশ্বাস এবং দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের বলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের চেষ্টার সফল পরিণতি দেখিবার মত সৌভাগ্য কাহার হইবে একমাত্র ভগবানই তাহার বিধান কর্ত্তা। আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, আমি আমার কাজ করিয়া যাইব, তারপর যাহা হয় হইবে।

আর একটা কথা বলিয়াই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমি সুইট্জারল্যাণ্ডে যাইব কি না বর্ত্তমানে তাহা আমি স্থির করিতে পারি না। বর্ত্তমানে শরীরের অবস্থার দিক হইতেই সুইট্জারল্যাণ্ড যাইবার ক্লেশ সহ্য করিতে আমি অক্ষম। বর্ত্তমানে প্রথমতঃ ভারতের কোন স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়া আমাকে স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইবে। কতদিনে আমি সুইট্জারল্যাণ্ড যাইবার উপযুক্ত স্বাস্থ্য লাভ করিব তাহার কোন স্থিরতা নাই। যাহা হউক, চিকিৎসকদের অভিমত এই যে, আমি অন্ততঃ আরও অনেকটা সুস্থ হইবার পূর্ব্বে সুইট্জারল্যাণ্ড যাওয়ার কথা উঠিতেই পারে না। আবার আমি যদি ভারতের কোন

স্বাস্থ্য-নিবাসে অবস্থান করিয়াই আশানুরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি তাহা হইলে এবং স্বেচ্ছানির্ব্বাসন বরণ করিয়া না লইলে সুইট্জারল্যাণ্ড যাইবার আবশ্যকতাই বা কি ?

অতঃপর সুইট্জারল্যাণ্ড যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে আমাকে আমার আর্থিক সমস্যা ও আর্থিক সংস্থান সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইবে। পরিবারবর্গের সহিত, বিশেষ ভাবে পিতামাতার সহিত, আলোচনা করিতে হইবে। কয়েক মাসের মধ্যেই বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং বাঙ্গলা সরকারের ধারণাও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে এ সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যাহা হউক, এ বিষয়ে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার মধ্যে না যাইয়া আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে চাই, যদি সরকার আমার সুইট্জারল্যাণ্ডে বাস বাধ্যতা-মুলক বলিয়াই মনে করেন তাহা হইলে আপনারা কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই কথাবার্ত্তা চালান বন্ধ করুন। ঈশ্বর মহান্—অন্ততঃ তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ ।অপেক্ষা মহান্,—আমরা তাঁহাতে যখন বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি তখন আমাদের দুঃখ করিবার কারণ থাকিতে পারে না।

আমার প্রতি অনুরক্ত ও সহানুভূতিসম্পন্ন অনেকের মনঃপীড়ার কারণ হওয়ায় আমি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু এই মনে করিয়া আমি সান্ত্বনা লাভ করিতেছি যে, যাঁহারা একই মাতৃভূমির প্রতি আস্থাসম্পন্ন তাঁহারা পরস্পরের সুখের ও দুঃখের অংশ সমানভাবে গ্রহণের অধিকারী। আশা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি—

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

উত্তর-কলিকাতা অধিবাসীবৃন্দের নিকট নিবেদন

ফেল্‌সল্‌ লজ

শিলং

১০৮।২৭

শ্রদ্ধা পুরঃসর নিবেদন,—

গত বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনের সময়ে আমি উত্তর-কলিকাতায় অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে সদস্যপদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াই। তদুপলক্ষে মান্দালয় জেলে অবস্থান কালে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে আপনাদিগকে যে নিবেদন-পত্র পাঠাই তাহা আপনাদের নিকট পৌছায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষেরা যে কারণেই হউক সে পত্র যথাস্থানে প্রেরণ করা সমীচীন বোধ করেন নাই। তাঁহারা আমার এই সামান্য নিবেদন পত্র কেন আটকাইলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনও উত্তর পাই নাই। তারপর আমার নির্ব্বাচন সম্পর্কীয় ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের নিকট যে পত্র দিই তাহার মধ্যে অনেকগুলি গন্তব্যস্থানে পৌছাইতে পারে নাই। আমার কারারুদ্ধ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর নিকট শুনিয়াছি যে, আমি যাহাতে কারাগৃহ হইতে নির্ব্বাচন সম্পর্কীয় কোন কাজ চালাইতে না পারি—ইহাই কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায় ছিল।

কিন্তু আমার নিবেদন-পত্র আপনাদের হস্তে না পৌছাইলেও বোধ করি কারার নীরব আকুল নিবেদন আপনাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। তাই আপনারা আমার নিবেদন না শুনিয়াই, অতি-প্রবল যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী

থাকা সত্ত্বেও আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে এত বেশী ভোট দিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। যে দিন রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে মান্দালয় জেলের নিভৃত কক্ষে বসিয়া আমরা কয়েকজন রাজবন্দী সাফল্যের সংবাদ পাই—সে সময়ে প্রকাশ্যভাবে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইবার উপায় আমার ছিল না। কিন্তু আমি ভরসা করি যে, গিরি নদী এবং অরণ্যানীর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আমার হৃদয়ের বাণী আপনাদের নিকট পৌঁছিয়াছিল।

আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতার কারণ এই যে, যে অবস্থায় পড়িলে সাধারণতঃ বন্ধুকে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও চিনিতে পারে না, ঠিক সেই অবস্থায়—রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক যখন আমি লাঞ্ছিত—আপনারা আমলাতন্ত্রের ভ্রূকুটিতে বিচলিত না হইয়া আমাকে সম্মানের উচ্চ বেদীতে বসাইয়াছেন। আমার উপর ঈদৃশ প্রীতি ও বিশ্বাস দেখাইয়া আপনারা যে শুধু আমাকে ধন্য করিয়াছেন তাহা নয়—আপনারা সকল রাজবন্দীকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন।

কারাবাসী থাকিতে আপনাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার ও দেশের বর্ত্তমান সমস্যা বিষয়ে আপনাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাই নাই। মনে করিয়াছিলাম, যখন মুক্তি পাইব তখন এই দুইটী কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিব। মুক্তি লাভের আশা পূর্ব্বে মোটেই ছিল না, কিন্তু হঠাৎ যে দিন অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্ত হইলাম সেই দিন আমি ভগ্নস্বাস্থ্য ও শয্যাগত। আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে আমার যাহা কর্ত্তব্য আমার মুক্তির পর আমি আজ পর্য্যন্ত তাহা করিতে পারি নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনাদের সহিত পরিচয় স্থাপন না করিয়াই আরোগ্য লাভের আশায় আমাকে এখানে চলিয়া আসিতে

হইয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে এখনো বিলম্ব আছে, অথচ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছি, এই নিমিত্ত স্থির করিলাম যে, আপাততঃ পত্রের দ্বারাই আপনাদিগকে আমার নিবেদন জানাইব।

আমার মুক্তির পর আপনারা আমাকে যে ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন এবং আমার আরোগ্য ও মঙ্গল কামনার্থে যাহা করিয়াছিলেন তাহা আমি ভুলিতে পারিব না। আপনারা আমায় সেবার অধিকার দিয়া ধন্য করিয়াছেন; আমি যাহাতে সেই অধিকারের যথোচিত ব্যবহার করিতে পারি তাহাই আমার একান্ত কামনা। আপনারা আমার উপর প্রীতি ও বিশ্বাস প্রদর্শনের দ্বারা আমায় সম্মানিত করিয়াছেন; আমি যেন তার কথঞ্চিৎ যোগ্য হইতে পারি—ইহাই ভগবানের চরণে আমার আকুল প্রার্থনা।

সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে বিলম্ব থাকিলেও আপনাদের আশীর্ব্বাদ ও শুভ ইচ্ছার ফলে আমি ধীরে ধীরে আরোগ্যের দিকে চলিয়াছি। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা লাভ করিলেও মানসিক শান্তি লাভ করা সহজ নয়। বাঙ্গলার এতগুলি স্বদেশ-বৎসল যোগ্য সন্তান যখন বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে কারাক্লেশে নিষ্পিষ্ট হইতেছেন, বাঙ্গলার এতগুলি নর-নারী যখন কারারুদ্ধ প্রিয়জনের দুঃখ কষ্ট ও দৈনন্দিন লাঞ্ছনার চিন্তায় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে অসহায় ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন—বাঙ্গলার এতগুলি গৃহ যখন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, ভাই, স্বামী ও পিতার বিহনে শ্মশান-প্রায় হইয়াছে—তখন কোন্ বাঙ্গালী নিশ্চিন্ত মনে আহার নিদ্রায় কাল কাটাইতে পারে? বাঙ্গলার গবর্ণর আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমি এবার কাউন্সিলে উপস্থিত না হইলেও সদস্য তালিকা হইতে আমার নাম কাটা যাইবে না। কিন্তু তবুও ইচ্ছা করে যে, কাউন্সিলের আগামী

অধিবেশনে রাজবন্দীদের কথা যখন উত্থাপিত হইবে তখন আমি উপস্থিত থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করি। চিকিৎসকদের অনুমতি পাইব কি না জানি না, যদি পাই, তবে কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় গিয়া প্রতিনিধির কর্ত্তব্য যথাশক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করিব। যদি যাইতে পারি এই আশায় কতকগুলি প্রস্তাব ও প্রশ্নের নোটিশ যথাসময়ে কাউন্সিলের জন্য পাঠাইয়াছি। কিন্তু যদি চিকিৎসকদের অনুমতি না পাই তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব আরোগ্যলাভ করিয়া যাহাতে জনসেবার্থ পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারি, তাহার জন্য সচেষ্ট হইব। চারিদিকে নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। জাতির জীবনস্রোতে আবার যখন বানের ডাক আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে তখন যেন কায়মনে প্রস্তুত থাকিতে পারি, ইহাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

কিমধিকং। আপনারা আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন। ইতি—

উত্তর-কলিকাতা অধিবাসীগণের নিকট নিবেদন

[মান্দালয় জেল হইতে ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭ তারিখে লিখিত নিবেদন-পত্রটি কর্তৃপক্ষ আটক করেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল]

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে আমি জাতীয় মহাসমিতি (কংগ্রেস কমিটি) কর্ত্তৃক উত্তর-কলিকাতার অ-মুসলমান বিভাগের জন্য সভ্য-পদপ্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়াছি। জনমতের আনুকূল্যের সংবাদ

পাইয়া স্বদেশসেবী ও শুভার্থীগণের উপদেশে এবং দেশের ও দশের সেবার অধিকতর সুযোগ পাইবার ভরসায় আমি জাতীয় মহাসমিতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি। আমি কারাবাসী না হইলে সদস্য-পদপ্রার্থী হইবার পূর্ব্বেই যে ভাবে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনাদের মতামত লইতাম, আমার বর্ত্তমান অবস্থায় আমি তাহা করিয়া উঠিতে পারিলাম না; কিন্তু আমি আশা করি, আপনারা নিজগুনে আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

কারারুদ্ধ অবস্থায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হওয়া উচিত কি না এবং নির্ব্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে কি না—সে বিষয়ে আমি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছি। জাতীয় মহাসমিতিও এ বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া এবং নির্ব্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে স্থির করিয়া আমাকে দাঁড়াইতে আদেশ করিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আজ জীবিত থাকিলে তিনিও আমাকে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে আদেশ করিতেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুনঃ নির্ব্বাচনের সময়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমার এই ধারণা সমর্থন করে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ও বর্ত্তমান অবস্থায় আমার নির্ব্বাচনপ্রার্থী হওয়ার সার্থকতা আছে ভাবিয়া আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। জনমতের আনুকূল্যও যে আমার এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য অনেকটা দায়ী তাহা বলা বাহুল্য। সুযোগ থাকিলে ও সম্ভবপর হইলে আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জাতীয় সমস্যা বিষয়ে আমার সকল মতামত আপনাদের নিকট নিবেদন করিতাম এবং আপনাদের উপদেশ ও পরামর্শ শুনিতে চাহিতাম। কিন্তু সে অধিকার হইতে আমি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি। প্রায় দুই বৎসর

হইতে চলিল আমি বিনা-বিচারে ও বিনা অপরাধে কারারুদ্ধ। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমাকে গবর্ণমেন্টের কোনও আদালতের সামনে উপস্থিত করা হয় নাই। এমন কি আমার বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের কি অভিযোগ ও সাক্ষ্য আছে তাহাও প্রকাশ্যে অথবা জনান্তিকে আমাকে বলা হয় নাই। আমার অপরাধ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, অপরাধ যদি কিছু করিয়া থাকি তাহা এই যে, পরাধীন জাতির সনাতন গতানুগতিক জীবনপন্থা ছাড়িয়া কংগ্রেসের একজন দীন সেবকহিসাবে স্বদেশ-সেবায় মন-প্রাণ-শরীর সমর্পণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তারপর আমি যে শুধু কারারুদ্ধ হইয়াছি তাহা নয়, বিশ মাস হইল আমি দেশান্তরিত। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলের পবিত্র স্পর্শ হইতে কতকাল যাবৎ আমি বঞ্চিত! তবে আমার সান্ত্বনা ও সৌভাগ্য এই যে, আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আজ "আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে, গোলাপ হয়ে" ফুটিয়াছে। এইখানে আসিবার পূর্ব্বে আমি বাঙ্গলাকে, ভারতভূমিকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুণ সোনার বাঙ্গলাকে, পুণ্য ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস—"স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা" বাঙ্গলার মোহনীয় রূপ আজ আমার নিকট কত পবিত্র, কত সুন্দর হইয়াছে। যে আত্যন্তিক আত্মোৎসর্গের আদর্শ লইয়া আমি কর্ম্মভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নির্ব্বাসনের পরশমণি আমায় দিন দিন সে মহাদানের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। যে চিরন্তন সত্য বাঙ্গলার ভাগীরথী ও বাঙ্গলার ঢেউ খেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার যে প্রাণধর্ম্মকে বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া দেশ-বন্ধু পর্য্যন্ত প্রতিভাবান মনীষিগণ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া

সাহিত্যের মধ্যে প্রকট করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার যে বিচিত্র রূপ কত শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকের লেখনী ও তুলিকার বিষয় হইয়াছে, আজ তাহার আভাস পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি। এই অনুভূতির পুণ্য প্রভাবে আমার দুই বৎসর কারাবাস সার্থক হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, যে, এহেন মায়ের জন্য দুঃখ ও বিপদ বরণ করা কত গৌরবের, কত সৌভাগ্যের কথা।

এইরূপ নিবেদনে নিজের পরিচয় দেওয়ার একটা রীতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আমার এমন কোনও সম্বল বা সম্পদ নাই যাঁহার উল্লেখ করিয়া আমি আপনাদের সহায়তা দাবী করিতে পারি। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যখন উচ্ছল জলধি তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত ভারতবাসীর প্রাণ দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য উতলা হইয়াছিল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন হইতে বাহির হইয়া আমি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি।

নিজের জীবন পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া ভারত-মাতার পদাম্বুজে অঞ্জলিস্বরূপ নিবেদন করিব এবং এই আন্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া পূর্ণতর জীবন লাভ করিব—এই আদর্শের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। স্বদেশসেবা বা রাজনীতির পর্য্যালোচনা আমি সাময়িক বৃত্তিহিসাবে গ্রহণ করি নাই। এই জন্য পরাধীন দেশে স্বদেশসেবকের জীবনে যে বিপদ ও পরীক্ষা, দুঃখ ও বেদনা অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য কায়মনে প্রস্তুত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি কি না, অথবা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি—তার বিচার করিবেন আমার দেশবাসিগণ। আমার এই ক্ষুদ্র অথচ ঘটনাবহুল জীবনে যে সব ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে বিঘ্নবিপদের সেই

কষ্টিপাথর দ্বারা আমি নিজেকে সূক্ষ্মভাবে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই নিবিড় পরিচয়ের ফলে আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, যৌবনের প্রভাতে যে কণ্টকময় পথে আমি জীবনের যাত্রা সুরু করিয়াছি, সেই পথের শেষ পর্য্যন্ত চলিতে পারিব; অজানা ভবিষ্যৎকে সম্মুখে রাখিয়া যে ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা উদ্‌যাপন না করিয়া বিরত হইব না। আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আমি এই সত্য পাইয়াছি—পরাধীন জাতির সব ব্যর্থ—শিক্ষা, দীক্ষা, কর্ম্ম—সকলই ব্যর্থ যদি তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় বা অনুকূল না হয়। তাই আজ আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে,—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?" আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি—আপনারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন—স্বরাজ-লাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিয়ত থাকিতে পারি।

আত্মোৎসর্গের পবিত্র ও জীবন্ত বিগ্রহ প্রাতঃস্মরণীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চরণে দেশসেবায় আমার প্রথম শিক্ষা দীক্ষা। তাঁহার জীবদ্দশায় সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার পতাকা অনুসরণ করিয়াছি। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিয়া ও তাঁহার মহিমাময় জীবনের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া একনিষ্ঠ ভাবে জীবনের পথে চলিব, এই সঙ্কল্প মনের মধ্যে পোষণ করি। সর্ব্বমঙ্গলময় ভগবান আমার সহায় হউন।

আমার এই উপস্থিত সমস্যার সমাধান. আপনাদের হাতেই ছাড়িয়া

দিলাম, কারণ এ নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে প্রবাসী রাজবন্দী পাহাড়, নদী ও সমুদ্রের ব্যবধানে থাকিয়া কি করিতে পারে? দেশমাতৃকার অকিঞ্চন সেবক হইলেও আমি তো আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত নহি। আজ সকলের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও কি আপনাদের উপর আমার কোন দাবী নাই? আমি প্রার্থনা করি, আপনারা ভুলিবেন না যে, আমার জয়ের অর্থ জাতীয় মহাসভার জয়, জনমতের জয়, আপনাদের জয়। সম্মুখে যে ব্যয়সাপেক্ষ নির্ব্বাচন সংগ্রাম তাহাতে আপনারাই আমার সহায় সম্পদ, বল ভরসা—সব কিছু। আপনাদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব, ইহাই আমার অভিপ্রায়। আমার সন্দেহ নাই যে, আপনারা আমাকে সেবার সুযোগ ও অধিকার দিয়া ধন্য করিবেন। আর অধিক কি বলিব—দেশমাতৃকায় মূর্ত্ত বিগ্রহ আপনারা। সাগরপারের বন্দীর সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি—

দেশবন্ধু

১

(পরলোকগত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত)

মান্দালয় জেল

১২।৮।২৫

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

'মাসিক বসুমতী'তে আপনার "স্মৃতি কথা" তিনবার পড়লুম—বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য-চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি; দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ক'রে

রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর জিনিষ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

যাহারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের মনের মধ্যে কতকগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা' নয়—আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও হাল্‌কা করেছেন। বাস্তবিক "পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করিতে হয় বেশী।" এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা—তাঁর অনুগ্রহ, কর্ম্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনও বুঝছে।

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সব চেয়ে ভাল লাগল—"একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই; পরের কাছে জানাইতে ভালোও লাগে না।" বাস্তবিক, হৃদয়ের নিগূঢ় কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায়? তারা উপহাস করলে হয় তো সে উপহাস সহ্য করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না করতে পারে তা' হলে অসহ্য বোধ হয়, মনে হয় "অরসিকেষু রস-নিবেদনং শিরসি মা লিখ।" আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কে বুঝতে পারে?

আর একটি কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার খুব ভাল লেগেছে। "...আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ।" প্রকৃতপক্ষে আমি এমন অনেককে জানি যাঁরা তাঁর মতে বিশ্বাস করতেন না—কিন্তু বোধ হয় তাঁর বিশাল হৃদয়ের মোহনীয় আকর্ষণে তাঁর জন্য তাঁরা কাজ না করেও

পারতেন না। আর তিনিও মত-নির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসতে পারতেন। সমাজের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে আমি তাঁকে মনুষ্যচরিত্র বিচার করতে দেখি নি। মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত—এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর তাঁর জীবনের ভিত্তি।

অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সব চেয়ে ঝগড়া। নিজের কথা বলতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হ'ত। কিন্তু আমি জানতুম যে, যত ঝগড়া করি না কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে—আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হ'ব না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, যত ঝড় ঝঞ্ঝা আসুক না কেন—তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার মিটমাট হ'তো মা'র (বাসন্তী দেবীর) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায় "রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আজ আমাদের ঘুচে গেছে।"

আপনি এক জায়গায় লিখেছেন—"লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই; অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালি-গালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!" সেদিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি—তখন নানা প্রকার অসত্যে এবং অর্দ্ধসত্যে বাঙ্গলার সব খবর-কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলেই নাই—এমন কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নাই। তখন স্বরাজ্য ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়ীতে এক সময়ে লোক ধ'রত না,

সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু—কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়েকটী প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্ণগৌরব ঘুরে এল—বাহিরের লোক এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল ক'রল—তখন আমরা কাজের কথাও বলবার সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে ভাণ্ডারে অর্থ-সঞ্চয় হ'ল, নিজেদের খবর-কাগজ প্রকাশিত হ'ল এবং জন-মত অনুকূল দিকে ফেরান হ'ল তা' বাহিরের লোকে জানে না—বোধ হয় কোনও দিন জানবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন! ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্ম্মভার—এই দুয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য ক'রতে পারল না।

অনেকে মনে করেন যে, তাঁর স্বদেশ সেবা-ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তাঁর পরিবারকেও দেশ-মাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলও হ'য়েছিলেন। ১৯২১ খৃঃ ধর-পাকড়ের সময়ে স্থির সঙ্কল্প করেছিলেন যে, একে একে তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আসবেন। নিজের ছেলেকে জেলে না পাঠালে পরের ছেলেকে তিনি পাঠাতে পারবেন না—এ রকম বিবেচনা তাঁর আদর্শের দিক থেকে খুব নিম্নস্তরের বলে আমার মনে হয়। আমরা জানতুম যে, তিনি শীঘ্রই ধরা পড়বেন, তাই আমরা বলেছিলুম যে, তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে তাঁর পুত্রের যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্ত্তমান থাকতে আমরা কোনও মহিলাকে যেতে দিব না।

অনেকক্ষণ ধ'রে তর্কবিতর্ক চলে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত হয় না—আমরা কোনও মতে তাঁর কথা স্বীকার করতে পারিনি। শেষে তিনি বলেন, "এটা আমার আদেশ—পালন করতে হবে।" তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধার্য্য করলুম।

তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা—তাঁর উপর তাঁর অধিকার বা দাবী নাই, সেইজন্য তাঁকে পাঠাতে পারলেন না। কনিষ্ঠা কন্যা তখন বাগ্‌দত্তা—তাঁকে পাঠান উচিত কি না—সে বিষয়ে ভীষণ তর্ক হ'ল। তিনি পাঠাতে চান—কন্যারও যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা; কিন্তু অন্যান্য সকলের মত—তাঁকে পাঠান উচিত নয়। কারণ একেই তিনি অসুস্থ, তারপর আবার বাগ্‌দত্তা—শীঘ্রই বিবাহ হবার কথা। এ ক্ষেত্রে দেশবন্ধু সাধারণের মত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। শেষে সিদ্ধান্ত হ'ল সর্ব্বপ্রথমে ভোম্বল যাবে—তারপর বাসন্তী দেবী ও উর্ম্মিলা দেবী যাবেন—এবং তাঁর ডাক যে-মুহূর্ত্তে আসবে তখনই যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

বাহিরের ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে—লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ভাব, যে আদর্শ যে প্রেরণা নিহিত রয়েছে—তার সন্ধান কয়জন রাখে? তাঁর সাধনা শুধু নিজেকে নিয়ে নয়—তাঁর সাধনা তাঁর সমস্ত পরিবারকে নিয়ে।

আমার মনে হয় যে, মহাপুরুষের মহত্ত্ব বড় বড় ঘটনার চেয়ে ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই বেশী ফুটে উঠে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের 'বসুমতী'তে আমি দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী ও অনুগত কর্ম্মীদের লেখা সযত্নে পড়লুম। অধিকাংশ লেখাই ভাসা ভাসা রকমের এবং কতকগুলো বাঁধা শব্দের পুনরুক্তিতেই পরিপূর্ণ, কেবল আপনি একা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার

বিশ্লেষণের দ্বারা দেশবন্ধুর চরিত্র অঙ্কিত করবার চেষ্টা করেছেন। তাই আপনার লেখা পড়ে যে কতদূর তৃপ্তি হ'ল তা বলিতে পারি না। * * * দেশবন্ধুর শিষ্য ও সহকর্ম্মীদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করেছিলুম। তাঁরা বোধ হয় কিছু না লিখলেই ভাল করতেন।

সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারি না যে, দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু ও দেহত্যাগের জন্য তাঁর দেশবাসীরা এবং তাঁর অনুচরবর্গও কতকটা দায়ী। তাঁরা যদি তাঁর কাজের বোঝা কতকটা লাঘব করতেন, তা'হলে বোধ হয় তাঁকে এতটা পরিশ্রম করে আয়ু শেষ করতে হ'ত না। কিন্তু আমাদের এমনই অভ্যাস যে, যাঁকে একবার নেতৃপদে বরণ করি, তাঁর উপর এত ভার চাপাই ও তাঁর কাছ থেকে এত বেশী দাবী করি যে, কোনও মানুষের পক্ষে এত ভার বহন বা এত আশা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাজনীতি-সংক্রান্ত সব রকম দায়িত্বের বকলমা নেতার হাতে তুলে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকতে চাই।

যাক্—কি বলতে আরম্ভ করে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা—শুধু আমরা কেন—এখানে সকলের অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি 'স্মৃতি-কথা'র মত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটী প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীঘ্র শূন্য হ'তে পারে না, অতএব লেখার জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না। আর আপনি যদি লেখেন, তবে সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমি বোধ হয় খুব বেশী দিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস

হবার তেমন আকাঙ্ক্ষা এখন আর নাই। বাহিরে গেলেই যে শ্মশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। এখানে সুখে দুঃখে স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্যে দিনগুলি এক রকম কেটে যাচ্ছে। পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত ক'রে যে জ্বালা বোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যেও যে কোনও সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আমি আজ এখানে—তাঁকে বাস্তবিক ভালবাসী—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বদ্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ একটা শান্তি—একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাহিরের হতাশা, বাহিরের শূন্যতা এবং বাহিরের দায়িত্ব—এখন আর মন যেন চায় না।

এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাঙ্গলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন—

সোনার বাংলা! আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায়ে বাঁশী।"

যখন ক্ষণেকের তরে বাঙ্গলার বিচিত্ররূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল—বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস—এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে!

কেন এ পত্র লিখে ফেল্লুম জানি না। আপনাকে পত্র দিব এ কথা আগে কখনও মনে আসেনি। তবে আপনার লেখা পড়ে কতকগুলো কথা মনে আসতে লিপিবদ্ধ করলুম। যখন লিখিয়া ফেলেছি—তখন পাঠিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয় দেবেন। তবে উত্তর দাবী করবার মত ভরসা রাখি না, যদি উত্তর দেন এই আশায় ঠিকানা দিলুম—

C/o D. I. G., I. B., C, I, D.
13 Elysium Row,
Calcutta.

[দেশবন্ধুর জীবনচরিত লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখিত]

মান্দালয় জেল
২০।২।২৬

জনসাধারণের পাঠের জন্য স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু লেখার মত সাহস আমার হয় নাই। কখনও হইবে কি না জানি না। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ এত গভীর রকমের ছিল যে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও নিকট তাঁহার বিষয় কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয় না। অধিকন্তু তিনি এত বড় ছিলেন এবং আমার হিসাবে আমি এত ক্ষুদ্র যে আমার সর্ব্বদা মনে হয় যে, তাঁহার প্রতিভা কত সর্ব্বতোমুখী, হৃদয় কিরূপ উদার ও চরিত্র কত মহান্ ছিল তাহা আজ পর্য্যন্ত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এরূপ অবস্থায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয়, ক্ষীণ চিন্তাশক্তি ও দীন ভাষার সাহায্যে সেই

প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবে ইচ্ছা ও সামর্থ্য না থাকিলেও বন্ধুর অনুরোধে অনেক কাজ এ জীবনে করিতে হয়—তাই আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে আমার এই প্রয়াস। দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষভাবে যতটুকু জানি এবং গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার জীবনের ও তাঁহার পুণ্যময় কর্ম্মের গূঢ় অর্থ আমি যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিতে গেলেও একটি পুস্তক হইয়া পড়িবে। অত কথা লিখিবার মত ক্ষমতা বা মনের অবস্থা আমার নাই, এই জন্য বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত আমি মাত্র কয়েক্‌টী কথার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

দেশবন্ধুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সকল কথা আমি অবগত নই। জীবন-চরিতের মধ্যে যে সব কথা আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় আমি জানি না। তাঁহার জীবনের মাত্র তিন বৎসর কাল আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হইয়া তাঁহার কাজ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেও চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিতে পারিতাম, কিন্তু চোখ থাকিতে কি আমরা চোখের মূল্য বুঝি? বিশেষতঃ দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অন্ততঃ আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিবেন, এবং তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি মর্ত্ত্যলোকের কর্ম্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন না। দেশবন্ধু নিজের কোষ্ঠীতে খুব বিশ্বাস করিতেন। আমি অবিশ্বাসী হইলেও তাঁহার বিশ্বাস যে আমার মনের উপর সংক্রামক প্রভাব বিস্তার করে নাই, এ-কথা বলিতে পারি না। আমার যতদূর স্মরণ আছে তিনি বহুবার আমায় বলিয়াছিলেন যে, সমুদ্রপারে দুই বৎসর কারাবাস তাঁহার

ভাগ্যে ঘটিবে। কারাবাসের অবসানে তিনি সসম্মানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মিটমাট হইবে এবং তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইবেন; তারপর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। সে সময়ে আমি বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সহিত সমুদ্রপারে যাইতে আমিও প্রস্তুত। সত্য কথা বলিতে কি সমুদ্রপারে আসার পর তাঁহার কোষ্ঠীর কথা স্মরণ করিয়া আমার মনে সর্ব্বদা আশঙ্কা হইত—পাছে তাঁহাকেও আসিতে হয়, কিন্তু সে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা শতগুণে দারুণ দুর্ভাগ্য বাঙ্গলার, তথা ভারতের ভাগ্যে ঘটিল।

* * *

দেশবন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। আরোগ্য লাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাইবার ভরসায় তিনি সিমলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। আমাকে দেখিতে তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দুইবার আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমার বহরমপুর জেলে বদলী হইবার পূর্ব্বে। প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধূলো লইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না।" তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সহিত বলিলেন, "না, আমি তোমাদের শিগ্‌গির খালাস করে আনছি।" হায়, তখন কে জানিত যে, ইহজীবনে আর তাঁহার দর্শন পাইব না? সেই সাক্ষাতের প্রত্যেক ঘটনাটি, প্রত্যেক দৃশ্যটি, প্রত্যেক ভাষাটি পর্য্যন্ত আমার মানসপটে চিত্রের ন্যায় আজও অঙ্কিত আছে এবং বোধ করি চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার সেই শেষ স্মৃতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কি, অনেকে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্ব্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দ্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্ব্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে; সুতরাং তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না। যাহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন। কত বিভিন্ন রকমের লোক তাঁহার হৃদয়ের টানে নিকটে আসিত এবং জীবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত তাঁহার প্রভাব ছিল! সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায় এই বিপুল জনসমাজে তিনি চারিদিক হইতে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন এরূপ কত দৃষ্টান্ত এখন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। যাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারা পর্য্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর তাঁহার সহকর্ম্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁহাদের উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কি না করিতে প্রস্তুত ছিলেন? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না—এ-কথা একশো বার সত্য। দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁহার অনুচরবর্গ এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ তাঁহার আদেশে কি না করিতে পারেন? কোনও ত্যাগ, কোনও কষ্ট, কোনও পরিশ্রম কি তাহাদের বিচলিত করিতে পারিত? অবশ্য জীবনদানের পরীক্ষা কোনও দিন হয় নাই—কিন্তু সে কথা বাদ

দিলে * বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার কাজ করিতে গিয়া সানন্দে সকলপ্রকার দুঃখ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাতে গৌরব অনুভব করিয়াছিল। দেশবন্ধুও জানিতেন যে তাঁহার অহিংস-সংগ্রামে তাঁহার এমন কতকগুলি সৈনিক আছে যাহাদের উপর তিনি সর্ব্বাবস্থায় নির্ভর করিতে পারেন। আজ আমি গর্ব্বের সহিত বলিতে পারি, দেশবন্ধুর পুণ্যজীবনের শেষদিবস পর্য্যন্ত তাঁহার শান্তিসেনা অটল অচলভাবে সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে দেশবন্ধুর সুসংযত, কর্ত্তব্যপরায়ণ, নির্ভীক অনুচরবৃন্দকে দেখিয়া অনেক তথাকথিত জননায়ক ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইতেন, তাঁহারাও হয় তো মনে মনে ঐরূপ অনুচরবর্গ পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু মূল্য দিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। সহকর্ম্মী বা অনুচরকে ভাল না বাসিতে পারিলে বিনিময়ে তাহার প্রাণ পাওয়া যায় না। সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁহার বাড়ী সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বত্র —এমন কি তাঁহার শয়ন-প্রকোষ্ঠেও সকলের গতিবিধি ছিল। তাঁহার অন্তরের এবং বাহিরের সম্পদের উপর সকলের দাবী ছিল। তিনি তাঁহার অনুচরবৃন্দকে যে শুধু ভালবাসিতেন তাহা নয়, তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা সহিতেও প্রস্তুত ছিলেন। একদিন তাঁহার একজন নিকট আত্মীয় তাঁহার কোনও সহকর্ম্মীর দোষ ও ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন,

* তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে ও কংগ্রেসের কাজ করিতে করি.ত কয়েকজনের দেহত্যাগও ঘটিয়াছিল।

"I hate him"—আমি তাকে ঘৃণা করি। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলেন, "আমার মুস্কিল এই যে আমি তাকে ঘৃণা করতে পারি না।" ইহা ব্যতীত বহিরঙ্গ লোকদের সহিত তাঁহার সহকর্ম্মীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে অনেক ঝগড়া-বিবাদ করিতে হইত। এইরূপ বিবাদের সময় আমি স্বয়ং কয়েকবার উপস্থিত ছিলাম এবং আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার অনুচরবর্গের প্রতি তাঁহার কত গভীর বেদনা, তাহাদিগকে সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার কত লাঞ্ছনা!

যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন না তাঁহারা দেশবন্ধুর সঙ্ঘগঠনের অপূর্ব্ব শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইতেন—হইবারও কথা। কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। আমি এস্থলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, তিনি যে পর্ব্বতের ন্যায় অটল সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল নায়ক ও অনুচরবর্গের মধ্যে প্রাণের সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোষ-গুণ-নির্ব্বিশেষে, ভালবাসিবার ক্ষমতার সাহায্যে এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলের দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পন্থী ও ভিন্ন-রুচির লোকদিগকে একত্র চালাইতে পারিতেন। তাঁহার দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন অথবা তাঁহার মত পোষণ করেন না এরূপ বহুলোক গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

অনেক তথাকথিত জননায়ক স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, দেশবন্ধুর অনুচরবর্গ বা সহকর্ম্মিগণ দাসত্বপরায়ণ ছিলেন। দেশবন্ধুর মন্ত্রণাগৃহে যাঁহারা কখনও উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা এ-কথা আদৌ সমর্থন করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। আলোচনা ও পরামর্শের সময়ে যাহারা নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিল, তাহাদিগকে আমি কি করিয়া দাসত্বপরায়ণ বলি? অধিকন্তু আলোচনার সময় নায়কের সহিত অনুচরবর্গের প্রায়ই

তুমুল ঝগড়া হইত, দেশবন্ধু আলোচনার সময় কখনও কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টবাদীর উপর তিনি কোনও দিন মনে বিরক্ত হইতেন না। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল যে, যাহারা বেশী আপত্তি তুলিত তাহাদের কথা তিনি বেশী শুনিতেন। অবশ্য এ কথা সত্য যে, মতভেদ হইলেও তাঁহার অনুচরেরা অসংযত বা উচ্ছৃঙ্খল হইত না অথবা নেতার উপর আক্রোশবশতঃ প্রকাশ্যে গালাগালি করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিত না। দেশবন্ধুর সঙ্ঘের প্রধান নিয়ম ছিল সংযম ও শৃঙ্খলা। পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিতে পারে কিন্তু ভোটের দ্বারা একবার কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেলে সেই পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। সঙ্ঘের নিয়মানুবর্ত্তী হওয়ার শিক্ষা এই পবিত্র ভারতভূমিতে নূতন নয়। ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসীকে এই শিক্ষা দিয়া যান। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৌদ্ধগণ প্রার্থনার সময়ে বলিয়া থাকেন—

(ব্রহ্ম ভাষায়)

বৌদ্ধান্দরণ গিম্‌সামি (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি)
ঢম্মান্দরণ গিম্‌সামি (ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি)
তঙ্গান্দরণ গিম্‌সামি (সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি)

বস্তুতঃ, কি ধর্ম্মপ্রচার, কি স্বদেশ সেবা সঙ্ঘ ও সঙ্ঘানুবর্ত্তিতা ভিন্ন কোনও মহান্ কাজ এ জগতে সম্ভবপর নয়।

আর একটী অভিযোগ আমি শুনিয়াছি—রাজনীতির আবর্ত্তে পড়িয়া দেশবন্ধুকে নাকি শিক্ষাদীক্ষাহীনভাবে নিম্নস্তরের লোকদিগের

সাহচর্য্য করিতে হইত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্মীর সংস্পর্শে দেশবন্ধু আসিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি নিম্নস্তরের লোক বলিয়া মনে করিতেন কি না আমি জানি না। কথাবার্ত্তায় তিনি সেরূপ ভাব কখনও প্রকাশ করেন নাই। হইতে পারে যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না বলিয়া এবং তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ তিনি অন্তরের ভাব গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁহার কারামুক্তির পর কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য সভা করেন। অভিনন্দনপত্রে দেশবন্ধুর গুণগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহারও বর্ণনা ছিল। তরুণের ভক্তি ও ভালবাসার অর্ঘ্য যখন তাহার নিকট নিবেদিত হইল তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ছিলেন চির-নবীন, চির-তরুণ; তাই তরুণের বাণী তাঁহার মরমে গিয়া আঘাত করিত। তিনি যখন সভার অভিনন্দন-পত্রের উত্তর দিবার জন্য উঠিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে। নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বেশীদূর বলিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, দুই গণ্ড বহিয়া পবিত্র অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল। তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।

যাহাদের জন্য তাঁহার এত সমবেদনা, যাহাদের প্রতি তাঁহার এত ভালবাসা তাহাদিগকে তিনি কি করিয়া নিম্নস্তরের লোক বলিয়া মনে করিতে পারেন তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

অবশ্য যাহারা দেশবন্ধুর কাজ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন

তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যা-বুদ্ধি অথবা আভিজাত্যের গর্ব্ব নাই। আশা করি, বিনয়রূপ পরম সম্পদ তাঁহারা কোনও দিন হারাইবেন না!

দেশবন্ধুর শেষ পত্র আমি পাই পাটনা হইতে, সে পত্র আজ সুদূর ব্রহ্মদেশে আমার নিকট তাঁহার অমূল্য শেষ স্মৃতি-চিহ্ন। তাঁহার সহকর্ম্মী ও অনুচরদের গ্রেপ্তারের পর তিনি যেরূপ যন্ত্রণায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন সেই পত্রে ছিল। সে যন্ত্রণা যে কত তীব্র তা শুধু তিনিই বুঝিতে পারেন যিনি তাঁহার প্রাণের পরিচয় পাইয়াছেন।

১৯২১ ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধুর সহিত ৮ মাস কাল কারাগারে কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুই মাস কাল আমরা পাশাপাশি "সেলে" (ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে) প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলাম এবং বাকী ৬ মাস কাল আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের একটি বড় ঘরে ছিলাম। এই সময়ে তাঁহার সেবার ভার কতকটা আমার উপর ছিল। আলিপুর জেলে শেষ কয়েক মাস তাঁহার একবেলার রান্নাও আমাদিগকে করিতে হইত। গভর্ণমেণ্টের কৃপায় আমি যে ৮ মাস কাল তাঁহার সেবা করিবার অধিকার ও সুযোগ পাইয়াছিলাম—ইহা আমার পক্ষে চরম গৌরবের বিষয়। ১৯২১ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্ব্বে আমি মাত্র ৩।৪ মাস কাল তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছিলাম। সুতরাং সেই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ভাল রকম বুঝিবার সুবিধা আমার হয় নাই। তারপর যখন ৮ মাস কাল একত্র বাস করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটিল তখন খাঁটি মানুষকে আমি চিনিতে পারিলাম। ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'familiarity breeds contempt'—বেশী ঘনিষ্ঠতা হইলে না কি অশ্রদ্ধা জন্মায়, কিন্তু দেশবন্ধু সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা

শতগুণে বাড়িয়াছে। এক-কথা বোধ হয় অন্যান্য সকলেই সমর্থন করিবেন।

দেশবন্ধু যে সহজ ও অনাবিল রসিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন এ-কথা আমি জেলখানায় ভাল রকম বুঝিতে পারি। কত রকমের রসিকতার দ্বারা তিনি দিনের পর দিন সকলকে আমোদিত করিয়া রাখিতেন! প্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের পাহারার জন্য সঙ্গীনধারী গুর্খা সৈনিক নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিন সকালে উঠিয়া তিনি দেখিলেন গুর্খা সৈনিকের পরিবর্ত্তে একজন রুলধারী হিন্দুস্থানী সিপাহী উপস্থিত। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি হে সুভাষচন্দ্র, শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশী; আমরা কি এতই নিরীহ ?" তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া অথবা ভাবিয়া চিন্তিয়া রসিকতা করিতে হইত না। পর্ব্বত-নির্ঝরিণীর ন্যায় তাঁহার রসিকতা আপনার প্রেরণায় আপনি ছুটিত, আমি তাঁহার এই গুণের বিশেষ উল্লেখ করিলাম তার কারণ এই যে, জাতিহিসাবে আধুনিক বাঙ্গালীর মধ্যে রসের বোধ কিছু কম। আমি অন্যান্য বিদেশীয় জাতিদের সহিত তুলনা করিয়া এ-কথা বলিতেছি; হইতে পারে ভারতের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা এখনও বাঙ্গালীর রসবোধ বেশী।

রসবোধ থাকিলে মানুষ প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে সহজে কাতর হয় না, সর্ব্বাবস্থায়ই মজা লুটিতে পারে। জেলখানার একঘেয়ে জীবনের আবর্ত্তে পড়িলে এ-কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে বুঝা যায়। দেশবন্ধুর রসিকতা এত সহজ ও অনাবিল ছিল যে, বয়সের তারতম্য অথবা আমাদের সম্বন্ধের দরুণ আমরা কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতাম না।

ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং ইংরাজী কবিদের মধ্যে তিনি ব্রাউনিং-এর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন।

ব্রাউনিং-এর অনেক কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তথাপি কারাগৃহে ব্রাউনিং-এর কবিতাগুলি তিনি বারংবার পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। দৈনন্দিন কথাবার্ত্তা ও রসিকতার মধ্যে তিনি সাহিত্য হইতে এত কথা উদ্ধার করিতেন যে নিজে ভাষ্য করিয়া না দিলে আমার পক্ষে সময়ে সময়ে রসবোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তিনি মানুষের নাম ভাল মনে রাখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে যে তাঁর অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সাহিত্যের অবতারণা করিয়া তিনি যেরূপ সাহিত্যকে সজীব করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপভোগের বস্তু করিতে পারিতেন, এরূপ আর কয়জন সাহিত্যিক করিতে পারিতেন বা পারেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।

তাঁহার কোনও আত্মীয়ের জন্য দেশবন্ধু এক সময়ে শতকরা ৯৲ সুদ হিসাবে দশ হাজার টাকা ধার করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা শোধ দিতে পারেন নাই বলিয়া উত্তমর্ণের এটর্নি খত পরিবর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। দেশবন্ধু তখন আলিপুর জেলে এবং আমরা তাঁহার নিকটেই। তাঁহার পুত্র চিররঞ্জনও সেখানে ছিলেন; তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, এই ঋণের কথা পরিবারবর্গের মধ্যে আর কেহ ইতিপূর্ব্বে জানিতেন না। যে আত্মীয়ের জন্য টাকা ধার করা হইয়াছিল; খত পরিবর্ত্তনের সময়ে তিনি লক্ষপতি। কিন্তু দেশবন্ধু দ্বিরুক্তি না করিয়া নূতন খতে দস্তখত করিয়া দিলেন। স্ত্রী, পুত্র কিংবা অন্য কোন আত্মীয়কে না জানাইয়া এইরূপ বহুঋণ করিয়া তিনি অপরের সাহায্য করিয়া দিতেন।

দেশবন্ধুর নিন্দা ও কুৎসা না করিয়া যাঁহারা জলগ্রহণ করেন না এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে আমি দেখিয়াছি বিপদের সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন

হইত। এই জাতীয় কোন ভদ্রলোক এক সময়ে দুই শত টাকার দাবী লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন—আমার তহবিলে মাত্র ছয় শত টাকা আছে, আমি কি করিয়া দুই শত টাকা দিই। ভদ্রলোকটি জিদ করিলেন—তিনিও বিলম্ব না করিয়া দুই শত টাকা তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। এই ব্যাপারটা দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর ঘটিয়াছিল।

যে আট মাস কাল তাঁহার সঙ্গে ছিলাম সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের সকল কথা ও অনুভূতি জানিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি কোনও দিন কোনও কাজে অথবা কোনও কথার মধ্যে নীচতার চিহ্ন পর্য্যন্ত পাই নাই। তাঁহার শত্রু রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের কথা জানিতেনও। কিন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না—এমন কি প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহাদের সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

কারাগারে দেশবন্ধু অধিকাংশ সময়ে অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন। ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক অনেক নূতন পুস্তক আনাইয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু সময়ের সঙ্কীর্ণতার দরুণ তিনি জেলখানায় থাকিতে পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল বলিয়া তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার আরব্ধ কাজ শেষ করিতে পারেন নাই। সে সময়ে রাজনীতি ও জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি ধর্ম্মনীতি—জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই মতের অনুকরণ বা অনুসরণ পছন্দ করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের জাতীয়তা শিক্ষা

ও জাতির প্রয়োজন হইতে আমাদের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ হইবে। এই জন্য তিনি বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ পছন্দ করিতেন না এবং তিনি এ বিষয়ে কার্ল মার্কসের বিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার আশা ছিল যে, ভারতের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে চুক্তিপত্রের (pact) সাহায্যে সকল বিবাদ দূর হইবে এবং জাতি-ধর্ম্ম-শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে। অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন যে, চুক্তিপত্রের সাহায্যে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হইতে পারে না, কারণ উহা সমবেদনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে, দর কষাকষির উপর নির্ভর করে না। দেশবন্ধু ইহার উত্তরে বলিতেন যে, আপোষে মিটমাট না করিয়া লইতে পারিলে মানুষ একদিনও এ সংসারে বাঁচিতে পারে না এবং মনুষ্য-সমাজও একদিনও টিকিতে পারে না। কি পরিবারে, কি বন্ধুমহলে, কি সমাজ-জীবনে, কি রাজনীতি-ক্ষেত্রে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে আপোষে মিটমাট সাধিত না হইলে মানুষের পক্ষে একত্র বাস করাই অসম্ভব। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য চলে শুধু চুক্তিপত্রের উপর, তাহার মধ্যে ভালবাসার নাম গন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতের হিন্দু-জন-নায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মত ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না,—অথচ সেই দেশবন্ধুই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মকে এত ভালবাসিতেন যে, তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। এইজন্য তিনি ইসলামকে

ভালবাসিতে পারিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কয়জন হিন্দু-নায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা মুসলমানকে আদৌ ঘৃণা করেন না? কয়জন মুসলমান জননায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা হিন্দুকে ঘৃণা করেন না? দেশবন্ধু ধর্ম্মমতহিসাবে বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্ম্মের লোকের স্থান ছিল। চুক্তিপত্রের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে, শুধু তাহারই দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা জাগরিত হইবে। তাই তিনি শিক্ষার (culture) দিক দিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন। হিন্দু শিক্ষা ও ইস্‌লামীয় শিক্ষার (culture) মধ্যে কোথায় মিল পাওয়া যায় এ বিষয়ে কারাগারে মৌলানা আক্রাম খাঁর সহিত তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত। আমার যতদূর স্মরণ আছে হিন্দু-মুসলমানের "শিক্ষার মিলনের" বিষয়ে মৌলানা সাহেব পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখিতে রাজী হইয়াছিলেন।

ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য, এ-কথা যেরূপ দেশবন্ধু জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। "স্বরাজ জনসাধারণের জন্য" এ-কথা পৃথিবীতে নূতন নয়। ইউরোপে বহুকাল পূর্ব্বে ও মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এ-কথা নূতন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্ত্তমান ভারতে' প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এ-কথা লিখিয়া গিয়াছেন কিন্তু স্বামীজির সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিধ্বনি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুনা যায় নাই।

তাঁহার কারামুক্তির পর হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত দেশবন্ধু যে সব কথা

প্রচার করিয়াছিলেন সে সব বিষয়ে তিনি তাঁহার কারাবাসের সময়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে সে সকল বিষয়ে আমাদের সহিত আলোচনা হইত। কাউন্সিল প্রবেশের কথা তিনি সেখানেই স্থির করিয়াছিলেন এবং বহু তর্কের পর আমরা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করি। কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব লইয়া তখন জেলখানার মধ্যে খুব দলাদলিও হইয়াছিল। দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্পও আমরা সকলে জেলখানায় করি। তবে দুঃখের বিষয়, তাঁহার কতকগুলি মহৎ সঙ্কল্প আজও কাজে পরিণত হয় নাই।

জেলখানার আর একটি ঘটনার উল্লেখ আমি এস্থলে না করিয়া পারি না—কয়েদীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা। আমরা যে সময়ে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হই, সে সময়ে আলিপুর জেলে আমাদের ওয়ার্ডে (ward।) মথুর নামে একজন কয়েদী কাজ করিত। জেলের ভাষায় যাহাকে বলে "পুরাণা চোর" মথুর তাহাই ছিল। তাহাকে বোধ হয় চোর বলিলে অন্যায় হয়, সে ছিল ডাকাত। আট দশ বার সে জেলখানায় ঘুরিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ডাকাতদের ন্যায়ই তাহার অন্তঃকরণ ছিল খুব সরল। কিছুদিন কাজকর্ম্ম করিবার পর দেশবন্ধুর উপর মথুরের ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিল—সে তাঁহাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মথুরের প্রতিও দেশবন্ধুর সমবেদনা ও ভালবাসা জাগরিত হইল। ক্রমশঃ সে আমাদের সকলের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। রাত্রে অথবা দিনের বেলায় তাঁহার পা টিপিবার সময়ে মথুর তাহার জীবনের সকল ইতিহাস তাঁহাকে বলিত। মুক্তির সময় নিকটবর্ত্তী হইলে দেশবন্ধু তাহাকে বলিলেন, যে তাহার খালাসের পর তিনি তাহাকে নিজের বাড়ীতে রাখিবেন, যেন সে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া পুনরায় ডাকাতিতে

মন না দেয়। মথুরও এই প্রস্তাবে যারপর-নাই আনন্দিত হইল এবং সে সঙ্কল্প করিল যে, অতঃপর সে অসৎ কাজ ও অসৎ সঙ্গ ছাড়িয়া দিবে।

মথুরের খালাসের দিন দেশবন্ধু লোক পাঠাইয়া তাহাকে জেলখানা হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসেন। তারপর প্রায় তিন বৎসর কাল মথুর তাঁহার নিকট ছিল। তাঁহার পরিচারক হইয়া সে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়াছে। দাগী চোর বলিয়া থানার পুলিশ কিছু কাল তার পশ্চাতে ঘুরিয়াছিল—তারপরে যখন দেখিল সে বাস্তবিকই দেশবন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিল। জমাদার তাহাকে দেখিলে প্রায় বলিত, "তুই বেটা মানুষ হয়ে গেলি!" আমার খুব ভরসা ছিল মথুরের আর পতন হইবে না, কিন্তু দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর পত্রদ্বারা যখন মথুরের খবর লইলাম তখন শুনিলাম সে ইতিপূর্ব্বে তাঁহার দার্জ্জিলিং বাসের সময় রসারোডের বাড়ী হইতে অনেকগুলি রূপার জিনিষপত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এ অদ্ভুত কথা শুনিয়া আমার Les Miserables-এর কথা মনে পড়িল। আমার এখনও বিশ্বাস যে, মথুর তাঁর সঙ্গে থাকিলে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের দরুণ লোভের বশীভূত হইত না। ক্ষণিক দুর্ব্বলতার বশে সে চুরী করিয়াছিল সন্দেহ নাই, তবে আমার বিশ্বাস যে তিনি জীবিত থাকিলে সে কোন দিন কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িত। এখন তাহার কি অবস্থা হইবে তাহা ভগবানই জানেন।

মানুষ একাধারে কি করিয়া বড় ব্যারিষ্টার, উদার-প্রেমিক, পরম-বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিগ্বিজয়ী বীর হইতে পারে—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ সকলের মনে উদয় হয়। আমি নৃ-তত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি—কৃতকার্য্য হইয়াছি কি না জানি

না। আর্য্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিনটী জাতির রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতকগুলি গুণ বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে, সুতরাং রক্তের সংমিশ্রণ হইলে গুণের সংমিশ্রণও হইয়া থাকে। রক্ত-সংমিশ্রণের ফলেই বাঙ্গালীর প্রতিভা এমন সর্ব্বতোমুখী এবং বাঙ্গালীর জীবন এত বৈচিত্র্যপূর্ণ, আর্য্যের ধর্ম্ম-প্রাণতা ও আদর্শবাদ, দ্রাবিড়ের কলাবিদ্যা ও ভক্তিমত্তা এবং মাঙ্গোলের বুদ্ধিকৌশল, অনুচিকীর্ষা ও বাস্তববাদ বাঙ্গলার সাগর-সঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে। বাঙ্গালী যে একসঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও ভাবুক, মায়াবাদ-বিদ্বেষী ও আদর্শবাদী, অনুকরণপ্রিয় ও সৃষ্টিক্ষম তাহা এই রক্ত-সংমিশ্রণের ফল। যে জাতির রক্ত কাহারও ধমনীতে প্রবাহিত হয় সে জাতির গুণ ও শিক্ষা (culture) জন্মের সময়ে সংস্কাররূপে তাহার চিত্তের মধ্যে স্থান পায়। বাঙ্গালী যেরূপ এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে বাঙ্গলার শিক্ষা (culture)—ও তদ্রূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গলার ইতিহাস ও সাহিত্যের সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তিনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গলার সভ্যতা আর্য্য-সভ্যতা হইলেও তাহা একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। স্বামী দয়ানন্দ উত্তরভারত জয় করিয়া আর্য্য-সমাজ আন্দোলন চালাইতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বাঙ্গলা দেশে আমল পাইলেন না কেন? আর কালীর ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে সহস্র সহস্র শিক্ষিত বাঙ্গালী কেন এত ভক্তি করে বা অনুসরণ করে? বাঙ্গলায় দায়ভাগের প্রচলন কেন? বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বত্র বিতাড়িত হইলে অবশেষে বাঙ্গলা দেশে কেন শেষ আশ্রয় পাইল? বাঙ্গলা দেশে কেন নব্য-ন্যায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল? বাঙ্গলা শঙ্করের মায়াবাদ গ্রহণ করে নাই কেন? বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গলা দেশ হইতে বিতাড়িত হইলে

শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের কেন সৃষ্টি হইল? এই সব প্রশ্ন তুলিলেই বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর শিক্ষাদীক্ষার একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গলার শিক্ষার মধ্যে প্রধানতঃ তিনটা ধারা দেখিতে পাওয়া যায়:—(১) তন্ত্র, (২) বৈষ্ণব ধর্ম্ম, (৩) নব্যন্যায় ও রঘুনন্দনের স্মৃতি। ন্যায় ও স্মৃতির দিক দিয়া আর্য্যাবর্ত্তের সহিত বাঙ্গলার নাড়ীর সংযোগ আছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের দিক দিয়া দাক্ষিণাত্যের সহিত বাঙ্গলার প্রাণের সংযোগ আছে। তন্ত্রের দিক দিয়া তিব্বতীয়, ব্রহ্মদেশীয় ও হিমালয় প্রান্তবাসী জাতিদের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ আছে।

ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন বাঙ্গালীকে তার্কিক ও নৈয়ায়িক-প্রকৃতি করিয়াছে। এই প্রকৃতি দেশবন্ধুর চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে বড় ব্যারিষ্টার করিয়া তুলিয়াছিল। কি নৈয়ায়িক, কি ব্যবহারজীবী উভয়েরই চুল-চেরা তর্ক লইয়া কারবার। দেশবন্ধু প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না আমি জানি না—তবে পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। খুব বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ন্যায় তিনি চুল-চেরা তর্ক করিতে পারিতেন এবং অবিরাম বাক্যস্রোতের দ্বারা শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে বড় নৈয়ায়িক হইতেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা হইতে টানিয়া লইয়া নীরস বেদান্তের ভিতর দিয়া প্রেমমার্গে লইয়া গিয়াছিল, দার্শনিক মতহিসাবে তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদকে সবচেয়ে খাঁটি মত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অনেক বিষয়ে সন্ন্যাসীর মত হইলেও

সন্ন্যাস তাহার ধর্ম্ম ছিল না। ভগবান যেরূপ সত্য তাঁহার লীলাও তদ্রূপ সত্য; ব্রহ্ম সত্য বলিয়া জগৎ মিথ্যা নয়। অতএব ভগবানকে পাইতে হইলে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এ সব বর্জ্জন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ভগবানের লীলা অনন্ত; সেই লীলার রঙ্গমঞ্চ শুধু বহির্জগতে নয়, মানুষের অন্তরেও। মনুষ্য-হৃদয় নিত্যবৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনে জীবের সহিত ভগবানের, রাধার সহিত কৃষ্ণের অনন্ত লীলা চলিয়াছে। তিনি রসময়; তাই সকল রসের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। এরূপ মত যিনি পোষণ করেন তিনি যে নেতি-মার্গ হইতে পারেন না—এ-কথা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ দেশবন্ধু বিশ্ব-সংসারকে, তথা মনুষ্য জীবনকে, পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারিয়াছিলেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সাহায্যে সে জীবনের সকল প্রকার বিরোধ দূর হইয়া যায় এবং সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়—এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম হইয়াছিল তাঁহার জীবনের শেষ আশ্রয়। তিনি কথাবার্ত্তায় এবং বক্তৃতায় প্রায়ই বলিতেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম্ম—এ সব আলাদা করিয়া দেখিলে চলিবে না, পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে এবং একটিকেও বাদ দিলে জীবন পূর্ণ হইবে না।

যে দার্শনিকতত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের সকল বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছিল তাহার বাস্তবরূপ প্রেমের মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে সকলের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রী সংস্থাপন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনে সামঞ্জস্য (synthesis) লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ভিন্নরুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের মধ্যে কোনও প্রকার গোঁজামিল ছিল না বলিয়া তিনি অপরের মধ্যে বিরোধ বা গোঁজামিল সহ্য করিতে পারিতেন না।

জেলখানার আলোচনার মধ্যে তাঁহার নির্ব্বিচার বদান্যতার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে তিনি বলিতেন, "দেখ তোমরা মনে করিবে আমি নিতান্ত বোকা ; লোকে আমাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি, আমার কাজ দিয়ে যাওয়া, তাই আমি দিয়ে যাই। বিচার করবার ভার যার উপর তিনি বিচার করবেন।"

যে তন্ত্রের উপদেশে বাঙ্গালী শক্তিপূজা শিখিয়াছে সেই তন্ত্রের প্রভাবে দেশবন্ধু অসাধারণ তেজস্বী বীর হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু অবশ্য কোনও দিন তান্ত্রিক সাধনা করেন নাই, অন্ততঃ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু কুলাচার, বীরাচার, চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি সাধনা না করিলে যে শক্তিমান হওয়া যায় না—এ-কথা আমি স্বীকার করি না। তন্ত্রের সার কথা শক্তিপূজা। জগতের মূল সত্য আদ্যাশক্তি, যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সেই আদ্যাশক্তিকে সাধক মাতৃরূপে আরাধনা ও পূজা করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব খুব বেশী বলিয়া বাঙ্গালী জাতিহিসাবে মায়ের অনুরক্ত এবং ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিতে ভালবাস। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও ধর্ম্মাবলম্বীরা (যথা ইহুদি, আরব, খৃষ্টিয়ান) ভগবানকে পিতৃরূপে আরাধনা করিয়া থাকে। ভগিনী নিবেদিতার মতে যে সমাজে নারী অপেক্ষা পুরুষের প্রাধান্য, সেখানে ভগবানকে লোকে পিতৃরূপে কল্পনা করিতে শিখে। অপর দিকে যে সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্য, সেখানে লোক ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে শিখে। সে যাহা হউক, বাঙ্গালী যে ভগবানকে—শুধু ভগবানকে কেন, বাঙ্গলা দেশকে এবং ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে ভালবাসে—এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। দেশকে আমরা মাতৃভূমি কল্পনা করিয়া থাকি, কিন্তু মাতৃভূমির ইংরাজী

তর্জ্জমা—father land আমরা অবশ্য mother land কথাটি চালাইয়া থাকি কিন্তু ইংরাজী ভাষার দিক হইতে তাহা শুদ্ধ নয়।

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে মাতৃভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গাহিয়াছিলেন—

"যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ"

এবং রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিয়াছিলেন—

"ও আমার জন্মভূমি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

তখন তাঁহারা তন্ত্রোপদিষ্ট মাতৃরূপের প্রভাবই দেখাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু মাতৃরূপের অনুরাগী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তাঁহার মাতৃভক্তির কথা অনেকেই জানেন। আলিপুর জেলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আমাদিগকে প্রায়ই পড়িয়া শুনাইতেন। বঙ্কিম-লিখিত মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত তাঁহার মাতৃভক্তি কত গভীর। তাঁহার "নারায়ণ" পত্রিকায় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইত, শাক্ত-ধর্ম্মেরও সেইরূপ অনুশীলন হইত। দুর্গাপূজা সম্বন্ধে যে কয়টী প্রবন্ধ "নারায়ণে" প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

দেশবন্ধুর ব্যবহারিক জীবনেও আমরা তন্ত্রের প্রভাব দেখিতে পাই। পারিবারিক জীবনে দেশবন্ধুর মাতৃভক্তির কথা অনেকে জানেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষায় ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় যে বিশ্বাস করিতেন, একথাও সর্ব্বজন-বিদিত। শঙ্করপন্থীদের উপদেশ "নারী নরকস্য দ্বারম্"—এ কথা তিনি আদৌ স্বীকার করিতেন না। বস্তুতঃ তাঁহার চিন্তাজগতে ও কর্ম্মজীবনে তন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার সভ্যতা ও শিক্ষার সারসঙ্কলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উদ্ভব হয় দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন।

তাঁহার গুণ বাঙ্গালীর গুণ, তাঁহার দোষ বাঙ্গালীর দোষ। তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় গৌরব ছিল যে, তিনি বাঙ্গালী। তাই বাঙ্গালী জাতিও তাঁহাকে এত ভালবাসিত। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, বাঙ্গালীর দোষগুণ লইয়াই বাঙ্গালী—বাঙ্গালী। কেহ বাঙ্গালীকে ভাবপ্রবণ বলিয়া ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করিলে তিনি ব্যথিত হইতেন। তিনি বলিতেন—আমরা ভাবপ্রবণ ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। তার জন্য লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।

বাঙ্গলার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গলার প্রকৃতিরূপে বাঙ্গলার সাহিত্যে, বাঙ্গলার গীতি-কবিতায়, বাঙ্গালীর চরিত্রে যে, সে বৈশিষ্ট্য মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—এ কথা দেশবন্ধু যেরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বে সেরূপ আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। অবশ্য ঐ ভাব তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। বঙ্কিম, ভূদেব প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ এই ভাবের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সাহিত্য ও শিক্ষার দিক দিয়া যে বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন দেশবন্ধু তাহা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য, দেশবন্ধু

যেরূপ গভীরভাবে এই চিন্তার ধারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, "নারায়ণ" পত্রিকার ভিতর দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে তিনি এই ভাবের প্রচারের জন্য এবং তদ্বিষয়ে মৌলিক গবেষণার সহায়তার নিমিত্ত এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিতে পারি যে, বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি তাঁহার মুখের বাণী ও লেখা হইতে শিখিয়াছি।

মনুষ্য জাতির শিক্ষা (culture) এক, না বহু—এ প্রশ্ন অনেকে তুলিয়াছেন। কেহ বলেন যে, শিক্ষার মধ্যে ভেদ নাই—শিক্ষা একই—তাঁহারা অদ্বৈতবাদী। অপরে বলেন যে, শিক্ষার মধ্যেও জাতি আছে, অতএব শিক্ষা বহু—তাঁহারা দ্বৈতবাদী। দেশবন্ধু কিন্তু ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। শিক্ষা বহু বটে, একও বটে। মূলতঃ যদিও মনুষ্য জাতির শিক্ষা এক—তথাপি সেই একের বিকাশ বহুর মধ্য দিয়া, বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া। উদ্যানে যেরূপ নানাপ্রকার বৃক্ষ থাকে এবং সেই সকল বৃক্ষে বিভিন্ন রকমের ফুল ফুটিয়া থাকে, মানবসমাজের মধ্যেও তদ্রূপ নানাপ্রকার শিক্ষা (culture) বিকাশলাভ করে। এই সকল পুষ্প ও বৃক্ষ লইয়া যেরূপ একটা উদ্যানের সত্তা, বিভিন্ন শিক্ষার সমাবেশে সেরূপ মনুষ্য জাতির শিক্ষা। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ শিক্ষার বিকাশ সাধন করিলে তার ফলে বিশ্বমানবের শিক্ষা পরিপুষ্ট হয়। জাতীয় শিক্ষাকে বর্জ্জন করিয়া অথবা অবহেলা করিয়া বিশ্বমানবের সেবা সম্ভবপর হয় না। দেশবন্ধুর স্বদেশপ্রেমের পরিণতি বিশ্বপ্রেমে; কিন্তু তিনি স্বদেশপ্রেমকে বাদ দিয়া বিশ্বপ্রেমিক হইবার প্রয়াস পান নাই। অপর দিকে তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে আত্যন্তিক স্বার্থপরতার দিকে লইয়া যাইতে পারে নাই।

দেশবন্ধু তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের মধ্যে বাঙ্গালীকে ভুলিয়া যাইতেন না। অথবা বাঙ্গলাকে ভালবাসিতে গিয়া স্বদেশকে ভুলিতেন না। তিনি বাঙ্গলাকে ভালবাসিতেন প্রাণ দিয়া, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা বাঙ্গলার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গলার বাহিরে তাঁহার যে সকল সহকর্ম্মী ছিলেন তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, দেশবন্ধুর সংস্পর্শে আসিবার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে তিনি তিলক মহারাজের ন্যায় ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণও তাঁহার নিকট তদনুরূপ ভালবাসা ও সহানুভূতি পাইতেন।

দেশবন্ধু বলিতেন, বাঙ্গলাকে স্বরাজ আন্দোলনের অগ্রণী হইতে হইবে। ১৯২০ খৃঃ বাঙ্গালা স্বরাজ আন্দোলনের নেতৃত্ব হারাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গলা আবার ১৯২৩ খৃঃ নেতৃত্ব ফিরিয়া পায়। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে, কবে ফিরিয়া পাইবে ভগবানই জানেন।

আর একটী কথা দেশবন্ধু প্রায়ই বলিতেন—ভারতবর্ষের কোনও আন্দোলন বাঙ্গলা দেশে চালাইতে হইলে তার উপর বাঙ্গলার ছাপ দিয়া লইতে হইবে। তিনি বলিতেন যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলন বাঙ্গলায় চালাইতে হইলে আগে বাঙ্গলার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বাস্তব জীবনের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ট পরিচয় আছে তাঁহারা এই মত সমর্থন না করিয়া পারিবেন না।

জনসাধারণের উপর, এমন কি তথাকথিত বড়লোকদের উপরও দেশবন্ধুর আশ্চর্য্য প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ তাঁহার প্রভাবের কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যখন

যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন তখন তাহা সাধন করিয়াছেন। "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্ শরীরং বা পাতয়েয়ম্" এই বাণী তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে গাঁথা ছিল। তিনি দুর্ব্বার বিক্রমে যখন যে পথে চলিতেন কেহ তাঁহাকে রোধ করিতে পারিত না। সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলরাশির ন্যায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার বেগে আপন আদর্শের পানে ছুটিতেন। প্রিয়জনের আর্ত্তনাদ অথবা অনুচরবর্গের সাবধান বাণীও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিত না। এই দিব্যশক্তি দেশবন্ধু কোথা হইতে পাইলেন? সে শক্তি কি সাধনার দ্বারা লভ্য?

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেশবন্ধু শক্তির সাধক হইলেও তিনি তন্ত্রমতে শক্তির সাধনা করেন নাই। তাঁহার প্রাণ ছিল বড়; আকাঙ্ক্ষা ছিল বড়। "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"—এই কথা যেন তাঁহার অন্তরের বাণী ছিল। তিনি যখন যাহা চাহিতেন—সমস্ত প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়া চাহিতেন। তাহা পাইবার জন্য একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। পর্ব্বতপ্রমাণ অন্তরায়ও তাঁহাকে ভীত বা পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যেরূপ এক সময়ে তাঁহার সম্মুখে আল্পস্ (Alps) পাহাড় দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"There shall be no Alps"—আমার সম্মুখে আল্পস্ পাহাড় দাঁড়াইতে পারিবে না,—তিনিও সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। কি সম্বল লইয়া তিনি "ফরওয়ার্ড" পত্রিকা প্রকাশে ও কাউন্সিল-জয়ের চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ যিনি জানেন তিনিই এই উক্তি সমর্থন করিবেন। আমরা কোনও প্রকার অসুবিধা বা বাধার কথা তুলিলে তিনি ধমক দিয়া বলিতেন—তোমরা একেবারে নির্ভরসা (তোমরা dessimist)। আমারও কাজ ছিল যেখানে কোন বিপদ বা অসুবিধার আশঙ্কা—সেই কথাটি

তুলিয়া ধরা, তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন—"you young old men"—ওহে অকাল বার্দ্ধক্য যুবকবৃন্দ। যাঁহারা মনে করেন যে, দেশবন্ধু মদরত প্রকৃতি ছিলেন এবং যুবকদের পাল্লায় পড়িয়া যিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চরমপন্থীর ন্যায় কাজ করিতেন—তাঁহারা তাঁহার স্বভাব ও প্রকৃতির সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন চির-নবীন—চির-তরুণ—তিনি তরুণদের আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিতেন; তাঁহাদের সুখদুঃখের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিতেন। তিনি তরুণদের সঙ্গ ভালবাসিতেন—তাই তরুণরাও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়িতে চাহিত না। এই সব কারণে আমি পূর্ব্বে দেশবন্ধুকে "তরুণের রাজা" বলিয়াছি।

তাঁহার ত্যাগ,পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিকৌশল (tact) প্রভৃতি গুণের কথা দেশবাসী অবগত আছে—সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবের আর একটি কারণ বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। সে কারণের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে আমি কতকটা পারিয়াছি। তিনি সর্ব্বদা অনুভব করিতেন যে, যখন যাহা তিনি করেন তাহা তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অঙ্গস্বরূপ। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সাহায্যে তিনি বাস্তবজীবন ও আদর্শের মধ্যে একটা মধুর সামঞ্জস্য (synthesis) স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সামঞ্জস্যবোধ ক্রমশঃ ওতপ্রোতভাবে তাহার প্রাণমনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি এই অনুভূতির ফলে নিজেকে ভগবানের অনন্তলীলার যন্ত্রস্বরূপ মনে করিতেন। নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে মানুষের "অহং কর্ত্তা" এই জ্ঞান লোপ পাইয়া আসে। অহঙ্কার লোপ পাইলে মানুষ দিব্য শক্তির আধারে পরিণত হয়। তখন তাঁহার শক্তির নিকট সাধারণ মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। দেশবন্ধুর হইয়াছিল তাহাই; তাঁহার জীবনের শেষদিকে

তাঁহার প্রবল শত্রু তাঁহার সম্মুখীন হইলে যেন ভগ্নপৃষ্ঠ হইয়া পড়িতেন। দেশবাসীর মনেও ক্রমশঃ এই ধারণা জন্মিতেছিল—যত্র দাশ মহাশয় তত্র জয়।

তিনি কত রকম লোককে দিয়া কত দিকে কাজ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় দেশবাসী অবগত নহেন। তাঁহার অনুপ্রেরণার ফল যে দিন ফলিবে দেশবাসী সে দিন তাহা জানিবেন। আদর্শের নিত্য অনুপ্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত হইতেন এবং তাহার সংস্পর্শে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাও উদ্দীপিত হইতেন। জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তাঁহার ছিল এক ধ্যান, এক চিন্তা—স্বদেশ-সেবা এবং সেই স্বদেশ-সেবা তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের সোপান স্বরূপ।

দেশবন্ধুর জীবনের কথা উল্লেখ করিলে যদি আর এক জনের কথা না বলা হয় তবে কিছুই বলা হইল না। যে দেবী লোক চক্ষুর অন্তরালে মূর্ত্তিমতী সেবা ও শান্তির মত ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা দেশবন্ধুর পার্শ্বে থাকিতেন, তাঁহাকে বাদ দিলে দেশবন্ধুর জীবনে কতটুকু বাকী থাকে কে বলিতে পারে? ভোগের অতুচ্চ শিখরে যিনি হিন্দু রমণীর আদর্শ লজ্জা, নম্রতা ও সেবা কোনও দিন বিস্মৃত হন নাই—বিপদের ঘনান্ধকারে যিনি হিন্দু পতিব্রতার একমাত্র সম্বল—চিত্তস্থৈর্য্য ও ভগবদ্বিশ্বাস হারান নাই—সেই দেবীর কথা লিখিতে গেলে আমি ভাষা খুঁজিয়া পাই না। দেশবন্ধু ছিলেন তরুণদের রাজা। তাহার পতিব্রতা সাধ্বীপত্নী ছিলেন—তরুণদের মাতা। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর তিনি আজ শুধু চিররঞ্জনের মাতা নন্, শুধু তরুণদের মাতা নন্—তিনি আজ নিখিল বঙ্গের মাতা। বাঙ্গালীর হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ আজ তাহার চরণে সমর্পিত।

আলিপুরের মামলায় অরবিন্দবাবুর সমর্থনকালে দেশবন্ধু ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন—

He will be looked upon as the poet of patriotism, the prophet of nationalism and the lover of humanity. His words will be echoed and reecheod etc.

এই কথাগুলি কি আজ দেশবন্ধু সম্বন্ধে প্রযুজ্য নয়?

সমাপ্ত